দাম : বারো টাকা

বেঙ্গল ভায়োলেন্স :
ভোট-পরবর্তী হিংসার
প্রকৃতি ইসলামীয়— পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

একুশের নির্বাচন,
তৃণমূলের সন্ত্রাসের
'খেলা' — পৃঃ ২৩

৭৪ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ২ মে, ২০২২।। ১৮ বৈশাখ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

এই রক্তক্ষয় কখনো ভোলার নয়

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ১৮ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২ মে - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

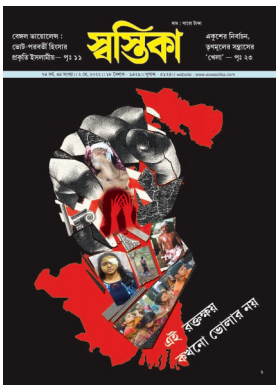

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

মমতার 'লক্ষ্মীছাড়া বাণিজ্য সার্কাস' ও 'কুমিরছানা'র অঙ্ক
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

সকলকে তৃণমূল নববর্ষের শুভেচ্ছা □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

বিনে পয়সায় মাল দেওয়ার গোলকধাঁধা
□ আর জগন্নাথন □ ৮

ভারতীয় অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত □ বিশ্বামিত্র □ ১০

বেঙ্গল ভায়োলেন্স : ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রকৃতি ইসলামীয়
□ দেবযানী ভট্টাচার্য্য □ ১১

স্বাধীনতা সংগ্রামে শিক্ষকদের ভূমিকা বর্তমানে উন্নত ভারত গড়তে প্রেরণা জোগাবে □ সাধন কুমার পাল □ ১৪

মধ্য প্রাচ্যে ভারতীয়দের অবস্থা কেমন?
□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৭

একুশের নির্বাচন, তৃণমূলের সন্ত্রাসের 'খেলা'
□ জগন্নাথ চ্যাটার্জী □ ২৩

হিংস্রতার আরেক নাম তৃণমূল কংগ্রেস
□ সুমন চন্দ্র দাস □ ২৬

বাঙ্গালির ফ্যাসিবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা □ অনুপম বেরা □ ২৮

বাংলা নাটকে পেশাদারিত্বের ছোঁয়া এনেছিলেন গিরিশচন্দ্র
□ কণিকা দত্ত □ ৩১

মোগল-পাঠানযুগেও বীর রাজা হিমু হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন □ ওমপ্রকাশ ঘোষ রায় □ ৩৩

রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ □ দেবাশিস চৌধুরী □ ৩৪

বাঙ্গালির অন্তর্জলি যাত্রা □ জিষ্ণু বসু □ ৩৫

দাগি দমনে ইতিহাস গড়ে ফিরে এসেছেন বুলডোজার বাবা
□ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৪৩

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই 'আফস্পা' আইন উঠেছে
□ তারক সাহা □ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ রঙ্গম : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯

প্রকাশিত হবে
৯ মে
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৯ মে
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

খাবারে কৃত্রিম রং কতটা ক্ষতিকর

বাজারে গেলে প্রায়ই চোখে পড়ে কৃত্রিম রং দেওয়া শাকসবজি ও ফল। নেতিয়ে পড়া শাকসবজি সতেজ করে রাখতে নানান রাসায়নিকের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে অতি নিম্নমানের রং। মিষ্টির দোকানে গেলেও আমরা দেখতে পাই নানা রংবেরঙের মিষ্টি। রাস্তার ধারে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন রঙের শরবত। আদতে এই রং খাওয়ার উপযোগী কিনা, এবং এই রং শরীরের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর— এইসব নিয়েই এবারের স্বস্তিকায় থাকবে বিশদ আলোচনা। লিখবেন ডা: শিবাজী ভট্টাচার্য, সৌরভ সিংহ, ড.কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার পাঠক, গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের জানানো হচ্ছে যে, বিশেষ কারণবশত আগামী ৪ জুলাই, ২০২২ সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র প্রতি কপির মূল্য ১৬.০০ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭০০.০০ টাকা করা হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হলো, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আশাকরি আপনারা আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

আগামী জুলাই মাস থেকে স্বস্তিকায় দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় পাঠাবেন—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**
Sreemani Market Branch, Kolkata - 700 006

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রতিহিংসার সেই দিনগুলি

রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদ বাহিনী কর্তৃক অসহায় নারী ও শিশুদের জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিবার সংবাদ শুনিয়া হুগলীর এক প্রত্যন্ত গ্রামের সুষমা নস্কর কী ভাবিতেছিলেন? তাঁহার কি মনে পড়িতেছিল একমাত্র পুত্র খোকনের কথা? খোকনের ইতিহাস বড়ো মর্মান্তিক। তিনি ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী এবং পশ্চিমবঙ্গের অগণন মানুষের মতো তিনিও একুশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির আশানুরূপ ফল না হইবার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস সেই স্বপ্নের মূল্য কড়ায়ক্রান্তিতে আদায় করিয়া লইয়াছিল। পথের কণ্টককে তাহারা বাঁচিতে দেয় নাই। বগটুই গ্রামে হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া সুষমা নস্করের কি চপারের আঘাতে ছিন্নভিন্ন পুত্রের শরীরটির কথা মনে পড়িয়াছিল, যাহাকে তিনি এই পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাহার হাত ধরিয়া চলিতে শিখাইয়াছিলেন, হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইলে উঠাইয়া দাঁড়াইতে শিখাইয়াছিলেন— এমনকী স্বপ্ন দেখাইতেও শিখাইয়াছিলেন। এইসব কথাই তিনি কি ভাবিতেছিলেন, নাকি অধিকতর আঘাতে তাঁহার মর্মে বাজিতেছিল খোকনের মাত্র তিন মাসের বিবাহিতা স্ত্রী সোমার শাঁখা ভাঙিবার দৃশ্যটি? যাহা দেখিয়া অস্ফুট ক্রন্দনে তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, হা ঈশ্বর!

সুষমা নস্করে কালাশৌচ আজিও শেষ হয় নাই। বস্তুত কাগজে-কলমে নির্বাচন পরবর্তী প্রতিহিংসার ঝড়ের অন্ত হইলেও এখনও পশ্চিমবঙ্গের গৃহে গৃহে কান পাতিলে অগণিত পুত্রশোকাতুরা জননী এবং অকালবিধবা পত্নীর দীর্ঘশ্বাস কর্ণগোচর হইবে। তাঁহারা স্বপ্ন দেখিবার মাশুল গনিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে স্বপ্ন দেখা নিষিদ্ধ নহে। অন্তত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অদ্যাবধি আইন করিয়া তাহা নিষিদ্ধ করেন নাই। কিন্তু বাম শাসনকাল হইতে একটি ভয়াবহ রীতি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এই রাজ্যে শাসকের নীতির বিরুদ্ধে কেহ কথা বলিলে তাহার আর নিস্তার নাই। সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া বামেরা চাহিয়াছিল পশ্চিমবঙ্গকে বিরোধীশূন্য করিতে। তৎকালীন বিরোধীনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই সন্ত্রাসের শিকার। কিন্তু ক্ষমতায় বসিয়া তিনি কণ্টকের সাহায্যে কণ্টক তুলিবার অভিলাষে আপন করিয়া লইলেন একদা যাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেন, সেই সন্ত্রাসকেই। তবে সন্ত্রাসের চেহারা অপরিবর্তিত থাকিলেও সন্ত্রাসের মুখচ্ছবিতে পরিবর্তন ঘটিল। বাম শাসনে প্রধান বিরোধী পক্ষ ছিল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল আমলে হইল ভারতীয় জনতা পার্টি। এই পটপরিবর্তনে এযাবৎ কালের রাজনৈতিক বিরোধিতার চরিত্রটি যে আমূল পালটাইয়া যাইল তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

কথাটি বিশদে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন। কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল আদি দলগুলির নিকট নির্বাচন হইল বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক অঞ্চল দখলের লড়াই। ভারতবর্ষ তাহাদের নিকট এইসব অঞ্চলের একটি সমষ্টি মাত্র। তাহার সামগ্রিক কোনো সত্তা নাই। অন্যদিকে বিজেপির নিকট ভারতবর্ষ একটি রাষ্ট্র, একটি চেতনা, মাতৃস্বরূপা এক অখণ্ড সত্তা। বিজেপি ভারতবর্ষকে জাতপাত ও নানা ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে ভাগ করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করিবার অভিলাষী নহে। অর্থাৎ কোনো নির্বাচনে বিজেপির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অর্থ ভারতীয়ত্ববোধের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। এই বোধ একবার মানুষের মনে মর্মরিত হইলে আঞ্চলিক দলগুলির অস্তিত্বসংকট আসিয়া উপস্থিত হয়। একুশের নির্বাচন-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের এই দ্বন্দ্বই দৃশ্যমান হইয়াছে। যাঁহারা আক্রান্ত হইয়াছেন তাঁহারা জাতীয়তার পরিচয়ে ভারতীয় এবং ভাষাগত পরিচয়ে বাঙ্গালি। যাঁহারা আক্রমণ হানিয়াছেন তাঁহারা নিজেদের ভারতীয় ভাবিতে চাহেন না, কেবলমাত্র বাঙ্গালি ভাবিয়াই আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে পশ্চিমবঙ্গ তো ডুবিবেই, ভারতবর্ষও সেই কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথাই বলিবার, নির্বাচন-পরবর্তী সেই হিংসা ভুলিয়া যাইলে চলিবে না। এই ঘোর অপমান বিস্মৃত হইলে তাহা চিরাচরিত বাঙ্গালিয়ানার সম্মুখে চরম সংকট আনিয়া উপস্থিত করিবে। এই ক্ষণে ধর্ম নহে, ভারতীয়ত্বের নিরিখেই বিচার করিতে হইবে কে বাঙ্গালি আর কে তাহা নহে। ভাষার অগ্রে স্থান দিতে হইবে সংস্কৃতিকে। অন্যথায় সুষমা নস্করের বিনিদ্র রজনী হইতে তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূর শাঁখা ভাঙিবার দৃশ্যটি কোনোদিন মুছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না।

সুভাষিতম্

মনসা চিন্তিতং কার্যং বাচা নৈব প্রকাশয়েৎ।
মন্ত্রেণ রক্ষয়েদ্ গূঢ়ং কার্য চাপি নিয়োজয়েৎ।।

মনে মনে চিন্তা করা কাজ বাইরে প্রকাশ করা উচিত নয়। মন্ত্রের মতো গুপ্ত রেখেই তা কার্যে পরিণত করা উচিত।

মমতার ‘লক্ষ্মীছাড়া বাণিজ্য সার্কাস’ ও ‘কুমির ছানার অঙ্ক’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে ‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী’। বৈদিক যুগে লক্ষ্মীকে আদিশক্তি রূপে পুজো করা হতো। সে সবের পাট চুকে গিয়েছে। নৈরাজ্য বঙ্গে লক্ষ্মী ডিজরেইলির প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোনো অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অনেক দিন আগেই ঠারেঠোরে বুঝিয়েছেন ‘তাঁর কোনো মত নেই। মমতার মতই তাঁর মত’। অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিজেপির কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও তাই। বামপন্থী অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত তাই ছিলেন। প্রতিটি সাংবাদিক সম্মেলন তিনি শুরু করতেন ‘মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে’ এই বলে। অশোক মিত্র একটু ঠোঁট কাটা ছিলেন। দলের সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় ১৯৮৬ সালে পদত্যাগ করেন।

> দশ বছরে রাজ্যের ঋণ ১৮৪ শতাংশ বেড়ে সাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। সে রাজ্যে সাড়ে ১৪ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি আসছে। এ নিয়ে কেবল ঠাট্টা মস্করাই করা যায়। গুরুত্ব দিলে বোকামি।

তবে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয়নি। সাত বছর পর লজ্জার মাথা খেয়ে ১৯৯৩ সালে অশোকবাবু দলের রাজ্যসভার প্রতিনিধি হন। মমতার বদান্যতায় অমিতবাবু এখন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদাভুক্ত। মমতার মন্ত্রিসভায় অমিতবাবুর এক সহকর্মী ঠাট্টা করে বলতেন অমিত ‘মন্ত্রী’ বা অর্থনীতিবিদ নয়। ও ‘ইভেন্টস ম্যানেজার’। বা ‘অনুষ্ঠান পরিচালক’। ২০১১ থেকে অমিতবাবু মমতার ছায়াসঙ্গী। ২০১৫-র বাণিজ্য সম্মেলন থেকে মমতার অনুষ্ঠান কর্মাধ্যক্ষ।

মমতা জানিয়েছেন বাণিজ্য বা শিল্প সম্মেলন আসলে ‘উৎসব’। ফলে অমিতবাবুকেই প্রয়োজন। শিক্ষা আর শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে যুক্ত দু’বারের শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তাই ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হয়েছে। উৎসব যাতে নিরানন্দ না হয় তার জন্য রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কাছে শিল্পপতিদের উত্যক্ত না করার আবেদন রেখেছেন মমতা।

বাণিজ্যে তদন্তের ছায়া আটকাতে মমতা কেন আগ্রহী? রাজ্যে অবৈধ কাজকারবার এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে মমতা এখন নিরুপায়। তাঁর মদতেই যে কেলেঙ্কারি এতটা বেড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মমতার ‘ভালো ছেলে’ বীরভূমের কেষ্ট মণ্ডল (অনুব্রত) ৯ বার সিবিআইয়ের জেরা এড়িয়েছেন। যেমন রাজীব কুমার। প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। মমতার কাছে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ পুলিশ অফিসার। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিজরেইলি বলেছিলেন মিথ্যা বা ভাঁওতা তিনরকম— মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা আর সংখ্যাতত্ত্ব বা স্ট্যাটিসটিক্স। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাণিজ্য সম্মেলন কীসের অন্তর্ভুক্ত তা বোঝা দায়। আমার মতে তা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর দাবি ছ’টি সম্মেলনে রাজ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব এসেছে। তবে কীভাবে আর কোন কোন খাতে তা তিনি জানাননি।

২০১৫-র পর থেকে ২ লক্ষ কোটি টাকা ধ্রুবক ধরে প্রতিটি সম্মেলনে তা বাড়ানো কমানো হয়েছে। প্রথম সম্মেলনে ২ লক্ষের সঙ্গে যোগ হয়েছিল ৪৩ হাজার কোটি টাকার লগ্নি। তারপর থেকে তা বেড়েছে আর কমেছে। ২০১৬-তে ৫০ হাজার কোটি, ২০১৭-তে ৩৫ হাজার কোটি, ২০১৮-তে কমে ১৯ হাজার কোটি আর ২০১৯-এ আবার একলাফে ৮৫ হাজার কোটি। অনেকটা ‘মা’ কুমিরকে ধূর্ত শেয়ালের কুমিরছানা দেখানোর হিসেবের মতো। অতিমারির দাপটে দু’বছর নৈরাজ্য বঙ্গের মানুষ কুমিরের লগ্নি হিসাব পায়নি। এবার তা এক লাফে ১ লক্ষ কোটি টাকা পার হয়ে ৩ লক্ষের মাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে।

মমতা জানিয়েছেন ২০২২-এ ৩ লক্ষ ২৪ হাজার কোটির লগ্নির প্রস্তাব এসেছে। অর্থাৎ এরপর থেকে ৩ লক্ষকে ধ্রুবক করে লগ্নিতে কুমির ছানা বাড়ানো কমানোর খেলা খেলবে। এবারে কীভাবে তা সম্ভব হলো? পৃথিবী জুড়ে মন্দা আর অনটন চলছে। কেবল নৈরাজ্য বঙ্গ বাদ। কী করে? দশ বছরে রাজ্যের ঋণ ১৮৪ শতাংশ বেড়ে সাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। সে রাজ্যে সাড়ে ১৪ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি আসছে। এ নিয়ে কেবল ঠাট্টা মস্করাই করা যায়। গুরুত্ব দিলে বোকামি। ২০১৫-২০১৮-র মধ্যে আনুমানিক সাড়ে ১৩ হাজার কোটি বা ০১.৪১৯৮২ শতাংশ লগ্নি হয়েছিল। বাকিটা কুমির ছানা। মমতার চেয়েও শেয়ালের সেই খেলায় পটু অমিত মিত্র। তাই আমার মতে মমতা নয়। অমিতবাবুই এই বাণিজ্য সার্কাসের প্রকৃত ব্যান্ড মাস্টার। অমিতবাবু মুখ। মমতা মুখোশ। □

সকলকে তৃণমূল নববর্ষের শুভেচ্ছা

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর সব পার্বণে যে থাকে তাকেই বলে তৃণমূল। দিদির দলের তো ১১৩ পার্বণ। আসলে বাঙ্গলায় যা হয় এবং যা হয় না সবই তৃণমূলের। সবই দিদির অনুপ্রেরণায়। এই যে এত বড়ো বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন হলো সেটাও তো আসলে তৃণমূলের। মোটেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়। ঠিক তেমনই এত মানুষের যে চাকরি হয়েছে মানে যেগুলো নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা চলছে সেগুলোও তৃণমূলের পার্বণ। দেখবেন, প্রতিটি মামলার সঙ্গে দিদির দলের কারও না কারও নাম জড়িয়ে রয়েছে। ভালো হোক বা খারাপ সবেতেই তৃণমূল আছে।

আপনারা খারাপ ভাবে নেবেন না প্লিজ। এই যে হাই কোর্টে রোজ একটা না একটা মামলা রয়েছে সেগুলো কি পাওয়া যেত তৃণমূল না থাকলে? তাই তৃণমূল নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। এক বছর আগে এই সময়েই দিদির নতুন সরকার শপথ নিয়েছিল। তৃতীয় তৃণমূল সরকার। তার মানে তৃণমূল নববর্ষের ১১ বছর পূর্তি হয়ে গেল। ভাবুন তো এই ১১টা বছরে কত কিছু পেয়েছে বাঙ্গালি। কোনও দিন ভাবা গিয়েছিল যে, মাত্র ন' মাসে আটখানা সিবিআই তদন্ত পাবে বাঙ্গলা! কেউ ভাবতে পেরেছিল বগটুই, হাঁসখালি, গাজোল, গাংনাপুর, নামখানা এতকিছু মাত্র এই এক বছরের মধ্যেই সম্ভব! সেই পার্কস্ট্রিট দিয়ে আমাদের সরকারের জমানায় 'সাজানো ঘটনা' শুরু হয়েছিল। এখনও চলছে। এই চালিয়ে যাওয়াটাকে ছোটো করে দেখবেন না প্লিজ।

এর পরেও আছে। গোরুপাচার, কয়লাপাচার, বিরোধী শিবিরের কর্মীদের হাত-পা ভেঙে দেওয়া, প্রাণে মেরে ফেলা এসব তো চালিয়ে যেতে হয়েছে।

> বাঙ্গলায় কাজ নেই, শিল্প নেই তো কী হয়েছে? কেন্দ্রের টাকায় একশো দিনের কাজ করে কোনওরকমে খেয়েপরে বেঁচে থাকা মানুষ রয়েছেন অনেক। সেটাই তো বাঙ্গলার গর্ব।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সবের মধ্যে একটার পরে একটা কেলেঙ্কারি তো করে যেতে হয়েছে। অভিষেক দাদা, রুজিরা বৌমা থেকে অনুব্রত দাদা সবাইকে ইডি, সিবিআই ডাকছে। সেটা তো আর এমনি নয়। সিবিআইয়ের তলব পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। অত সোজা নয়। আবার সে সবকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সিঙ্গল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চ কত কিছু করতে হয়। এগুলো কি পরব নয়! এর আগে শুনেছেন কখনও যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা এখনকার শিল্পমন্ত্রীকে সিবিআই ডেকে পাঠায়? বিষয়টাকে ছোটো করে দেখবেন না।

দিদির দলের আরও একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেউ ডাকে সাড়া দেওয়ার পক্ষে, কেউ আবার বিপক্ষে। কেউ হাসপাতালে ভর্তি থাকার পক্ষে, কেউ জেরায় মুখোমুখি হওয়ার পক্ষে। আর দিদি তো সবেতে একটাই কথা বলেন, কেন্দ্রের শত্রুতা। যদিও ইদানীংকালে কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তেই কেন্দ্র নেই। সবই আদালতের নির্দেশে।

এই যে শিল্প সম্মেলন হলো। সেখানে আম্বানি, আদানিরা এলেন। দেখুন, এই পরবে যাঁদের অন্য সময় গালি দেওয়া হয় তাঁরাই এলেন। পার্বণ হলো। সেখান থেকে বিনিয়োগ আসার কথা হলো। এর পরে সেই বিনিয়োগ যাতে না আসে সেটাও দেখা হবে। এটা কি উৎসব নয়। আর আমাদের দিদি দেশ, বিদেশের শিল্পপতিদের সামনে বললেন, এগিয়ে বাঙ্গলা। দেশের মধ্যে একশো দিনের কাজে এক নম্বরে বাঙ্গলা। বলুন তো, এর চেয়ে গর্বের কিছু হতে পারে! বাঙ্গলায় কাজ নেই, শিল্প নেই তো কী হয়েছে? কেন্দ্রের টাকায় একশো দিনের কাজ করে কোনওরকমে খেয়েপরে বেঁচে থাকা মানুষ রয়েছেন অনেক। সেটাই তো বাঙ্গলার গর্ব। এই গর্ব নিয়েই তো আমাদের বেঁচে থাকা। তৃতীয় দিদি সরকারের সাফল্য দেখুন। এই সময়ে কত টাকার ঋণ হয়েছে, কত দুর্নীতি হয়েছে, কত 'সাজানো ঘটনা' ঘটেছে, বিরোধী শিবিরের কর্মী মরেছে না দেখে বরং সাফল্য খুঁজুন। জানি সেটা কষ্টের। কিন্তু কষ্ট করে যাঁরা সেটা খুঁজতে পারবে তাঁদেরই তো দেশ মনে রাখবে।

খুঁজে পাচ্ছেন না! খুঁজুন, খুঁজুন। খোঁজা প্র্যাক্টিস করুন। □

অতিথি কলম

আর. জগন্নাথন

বিনে পয়সায় মাল দেওয়ার গোলকধাঁধা

বিলিয়ে দেওয়ার সহজতম 'রাজা সাজার' পদ্ধতিতে রাশ টানতেই হবে। এই কঠিন সিদ্ধান্ত এখনই না নিলে ভারতের প্রতিবেশী অন্যান্য দেশগুলি ও শ্রীলঙ্কার মতো দেউলে অবস্থা হতে দেরি হবে না।

ভোটের পর ভোটে নাগরিকদের বিনে খরচায় জিনিসপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বান বহুকাল ধরেই ডেকে আসছে। পরিবর্তন হিসেবে ইদানীং চোখ-কান বুজে জনতাকে কোষাগার খুলে বিলিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার এক বিপজ্জনক প্রবণতা দেশকে গ্রাস করতে চলেছে। সরকারি ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে সঠিকভাবে প্রশাসন চালানো বিশেষ করে ভবিষ্যতের অর্থভাণ্ডার যে কোনো বিপরীত পরিস্থিতির মোকাবিলা মজবুত রাখতে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিজেপি ও অবিজেপি রাজ্যগুলিকে ডেকে এখুনি লাগাম পরানোর প্রসঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

একথা বলার কারণ ভারতের বিশাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কে আগে গোল দিতে পারবে সে এক ভোটে জিতলেও ক্ষমতায় আসার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এক দুষ্ট প্রতিযোগিতা মাথা চাড়া দিয়েছে। এ সাইকেল ফ্রি দিলে ও মোটরবাইক ফ্রি দেবে বলছে, কেউই অর্থনীতির কথা ভাবছে না। শেষমেশ অর্থনীতি ধূলিসাৎ হবার পথে চলেছে। খারাপ অর্থনৈতিক ধারণাগুলি স্বাভাবিক কারণেই দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। একটি রাজ্য কিছু বিনামূল্যে দিলেই সারা দেশজুড়ে কে তাকে টপকে যাবে এমন একটা বিষম প্রতিযোগিতা নজরে পড়ছে। এই সূত্রে ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগেরীর আসন্ন নির্বাচনে দুটি প্রদেশেরই 'তেলুগু বিড্ডারা' উভয় রাজ্যেই ব্যাপক কৃষিঋণ মকুব ও নানাবিধ সস্তা ললিপপ নিয়ে জনতার দরজায় যান। ২০১৭ সালে এই প্রবণতা বেগবতী হয় যখন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি কৃষিঋণ মকুবের কথা বলে। এরপর কেউ ফিরে তাকায়নি। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বেশ কিছুদিন ধরে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চাপকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেও শেষাবধি কৃষি ঋণ মকুবের দাবিকে ভোট প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর যে প্রশ্নটুকু পড়ে থাকে তা হলো কত পরিমাণ কতটা বাড়ানো যেতে পারে?

সাম্প্রতিক পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে আবার প্রতিশ্রুতি-বিলাসী কেজরিওয়ালের আপ ৩০০ ইউনিট করে মাসিক বিদ্যুতের দাম মকুব করার কথা বলেছে। আপ দলের যে কোনো কর্মকাণ্ডেই মুগ্ধ হয়ে যাওয়া সদ্যোজাত পঞ্জাব মুখ্যমন্ত্রী জানেনও না একটি 'সিটি স্টেট' যা পূর্ণরাজ্য নয় এবং দেশের রাজধানী হওয়ার সুবাদে দিল্লির অর্থাগমের পরিমাণ অনেক বেশি। অন্যদিকে পুলিশি ব্যয় রাজ্যের না হওয়ায় খরচাও কম তাই পূর্ণ রাজ্য পঞ্জাবের সঙ্গে দিল্লির কোনোভাবে তুলনা চলে না।

দিল্লির বিনা রোজগারে খরচের যে আড়ম্বর বিশেষ করে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ব্যক্তিগত ভাবে সরকারি পয়সায় তুলে ধরার যে খরচ তা কখনই কোনো সুপ্রশাসন সমৃদ্ধ রাজ্যের মডেল হতে পারে না। ২০২১-২২ সালে দেশের সামগ্রিক জিডিপি-র সঙ্গে রাজ্যের ঋণের হারের যে অনুপাত পঞ্জাবের ক্ষেত্রে তা ৫৩ শতাংশ। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে তাদের আরও চিন্তা ভাবনা করা উচিত। কিন্তু তিনি এখন (ভগবৎ মান) তাকিয়ে আছেন বিজেপি শাসিত হিমাচল প্রদেশের দিকে। আগামী বিধানসভা ভোটে যেখানে ১২৫ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনা খরচায় সঙ্গে নিঃশুল্ক জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি আসতে চলেছে। এটা বোঝার জন্য বিশাল কোনো রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দরকার হয় না যে এই দুটি নিখরচার প্রতিশ্রুতি আগামীদিনে অর্থনীতিতে আবার দুর্যোগ টেনে আনবে।

জিডিপি ও ঋণের যে তুলনামূলক পরিসংখ্যান পঞ্জাবে দেওয়া হয়েছে তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় রয়েছে--- (১) রাজস্থান, (২) কেরল ও অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ। অবশ্যই এমন একটা অবমাননাকর খেতাব জয়ের জন্য নানা যুক্তিগুচ্ছ এই রাজ্যগুলি প্রত্যেকেই আলাদা ভাবে প্রস্তুত করে রেখেছে। এই প্রত্যেকটি রাজ্যই যে বিরোধী শাসিত সেটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। আজকের এই সময়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও তাঁর নিজস্ব অনুরাগী ও সমর্থকের সংখ্যা বিপুল। তিনিই সম্পূর্ণ একজন শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। আর তাঁকে মোকাবিলা করতে গিয়ে যখন অন্য কিছু করার নেই তখন করদাতাদের রক্তজল করা পয়সাটাই বিলিয়ে দিয়ে কেবল ভোট কেনার লড়াই গড়া যেতে পারে।

হ্যাঁ, এটা অবশ্যই মনে হতে পারে গরিবের হাতে নানা খাতে সরকারের টাকা দেওয়ার বিরোধিতা যারা করছে বিশেষ করে দিন দুনিয়ার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই শুধু ঠাণ্ডা ঘরে বসেই তারা বাণী ঝাড়ছে। অবশ্যই, যদি সত্যিই দরকার আছে ঠিক সেই গরিবদের ব্যাংকের খাতায় কোনো দালাল ছাড়াই সরাসরি সরকারের ভরতুকি গিয়ে জমা পড়ে তাতে কী ক্ষতি? এই অভিযোগ কড়ায়-গণ্ডায় সত্যি এমনটা মানতেই হচ্ছে, কিন্তু এখানেই লুকিয়ে রয়েছে ম্যাজিকের শেষ তাস। যখন করদাতাদের থেকে আদায় করা টাকা ব্যক্তিগত খাতে খরচ করা হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছে না গিয়ে বিশেষ কিছু লোকের কাছে পৌঁছয় তখন দেশ নিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেকে সরেই শুধু আসছে না, চাকরি তৈরির সম্ভবনাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় মানবেন জনগণের সম্পত্তি নির্মাণ করা অর্থাৎ পরিকাঠামো— ভালো রাস্তা, ভালো স্কুল, ভালো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ বহু স্থানে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ এগুলি বাড়ালে তবেই তো চাকরির সংস্থান বাড়বে। কিন্তু বিনা পয়সায় বিলিয়ে দেওয়ার নীতির বন্যায় সেসব ভেসে যাচ্ছে।

২০১৯-এ কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ১০ লক্ষ চাকরির পদ খালি আছে। রাজ্যগুলিতে শূন্যপদের প্রসঙ্গ তো আলাদা। যেগুলি যোগ করলে ৩০ লক্ষ তো হবেই। বিষয়টা কিন্তু বোঝা মোটেই শক্ত নয়। সরকার যখন বিপুল পরিমাণে কোষাগারের টাকা অনুদান আর ভরতুকিতে ঢালে, তখন সে নিজের টাকাই খেয়ে ফেলে, চাকরি দিয়ে মাইনে দেওয়ার কিছু থাকে না।

পরিকাঠামো নির্মাণখাতে খরচ কমানো মানেই চাকরির সব চেয়ে বড়ো বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা। আর অন্যদিকে সরকারের উচ্চপদে নতুন চাকরি না হওয়ার অর্থই হচ্ছে বিনা কাজে যে টাকা বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তারই প্রভাব কেবলমাত্র কিছু না কিছু খাতে বিনা পয়সায় করদাতার টাকা ভোগ করার সুযোগ করে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে সরকারি কোষাগারে অনটন অর্থাৎ চাকরির সম্ভাবনার মৃত্যু। ভারত কিন্তু একটি অদূরবর্তী অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার দিকে তাকিয়ে আছে যদি না কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি মিলে কতদূর পর্যন্ত বিনে পয়সায় অর্থনীতির ভিত্তিকে অটুট রেখে জিনিসপত্র বিলিয়ে দেওয়া যায় তা নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে না পৌঁছতে পারে।

মানতেই হবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলির তরফে দেশের মানুষের কাছে কোভিডের সময় প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য ও প্রাণধারণের উপযুক্ত বস্তুগুলি বিনা খরচায় যথা সময়ে পৌঁছে দিয়ে রাষ্ট্র সঠিক ও প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছে। কিন্তু চিরকালের জন্য প্রয়োজন ও যোগ্যতার কোনো মাপকাঠি না রেখে কোনো সরকারের পক্ষে সকলের জন্য (যে বিনা পয়সার চাল গম না পেয়েও সংসার চালাবার মতো অর্থাগম করে অনেকের ঈর্ষণীয় উপার্জন আছে) এই বিলিয়ে দেওয়ার নীতি অর্থনীতির মানদণ্ড বিরোধী।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী যিনি নাগরিকদের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী তাদের পাওয়ার অধিকারে নয় তাঁকেই এই পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিতে হবে। প্রথমেই তাঁর দলের ক্ষমতায় থাকা সরকারগুলিকে বোঝাতে হবে। তবে হ্যাঁ, ভারতের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনৈতিক পরিবেশে কেবলমাত্র বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিই অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবে এটা ভাবা ভুল। তবে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কেন্দ্রীয়ভাবে ডেকে এটা অবশ্যই পারস্পরিক ঐকমত্যের বিরুদ্ধে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা দরকার যে 'বিলিয়ে দেওয়ার' রাজনীতির একটা সীমারেখা টানা প্রয়োজন। যাদের নিজ ক্ষমতায় জীবনধারণের ক্ষমতা শুধু নয়, বহু বিলাসদ্রব্য ক্রয়ে যারা অভ্যস্ত তাদের এই উপঢৌকন দিয়ে দেশ ও রাজ্যের ঋণের বোঝা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে কেন দুর্বল করা হবে? একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্র-রাজ্য উভয় মিলে চাকরি সৃষ্টির সম্ভাবনা নির্ধারণকারী একটি কমিটি তৈরি করে দেবেন কেন না শেষ হিসেবে দারিদ্র ঘোচানোর বিষহরি তো সেই চাকরি। হায়! আমরা দারিদ্র দূরীকরণে কেবলমাত্র বিলিয়ে দেওয়ার নিদান দিয়ে চলেছি।

এই সূত্রে প্রধানমন্ত্রী অনেক আগেই এক জাতি এক নির্বাচন প্রসঙ্গ এনেছিলেন। কিন্তু বিরোধীরা ভাবল এটা তিনি তাঁর সুবিধের জন্য করছেন। কিন্তু এতে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতির রাস্তা কিছুটা আটকাতো। তাই হয়তো কেউ ভাবলই না। যাইহোক, এই প্রস্তাব না নিলেও বিলিয়ে দেওয়ার সহজতম 'রাজা সাজার' পদ্ধতিতে রাশ টানতেই হবে। এই কঠিন সিদ্ধান্ত এখনই না নিলে ভারতের প্রতিবেশী অন্যান্য দেশগুলি ও শ্রীলঙ্কার মতো দেউলে অবস্থা হতে দেরি হবে না। শ্রীলঙ্কায় মানুষেরা আজ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস জোটাতে পারছেন না। তাঁদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও নেই। তাই আমাদের ইতিবাচক পথ নিতেই হবে। রাজ্যগুলি যদি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী না হয় তাহলে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঠেকানো যাবে না।

(লেখক সম্পাদকীয় নির্দেশক, স্বরাজ্য)

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া খণ্ডের মুড়লু শাখার স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন প্রচারক বিশ্বনাথ কুম্ভকারের পিতৃদেব সতীশচন্দ্র কুম্ভকার গত ১৩ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ৪ পুত্র ও ৬ নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর ৪ পুত্র, দুই নাতিই প্রশিক্ষিত স্বয়ংসেবক। মেজ পুত্র বিশ্বনাথ ১১ বছর প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

বাঁকুড়া স্কুলডাঙ্গা প্রণবকুটির নিবাসী মা চম্পা গুপ্ত, প্রয়াত স্বয়ংসেবক রামপ্রসাদ গুপ্তের সহধর্মিণী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একনিষ্ঠ ভক্ত গত ২০ এপ্রিল পরমধামে যাত্রা করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে কল্যাণ আশ্রম, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নানান দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সুপুত্র শিবপ্রসাদ গুপ্ত এক সময় বাঁকুড়া নগরের ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তার একমাত্র নাতি দেবপ্রসাদ গুপ্ত বর্তমানে বাঁকুড়া নগরের কেশব সায়ং শাখার কার্যবাহ।

ভারতীয় অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত

ভারতীয় অর্থনীতিতে গত এক দশকের হতদরিদ্র অবস্থার যে বেশ উন্নতি হয়েছে, তার আভাস মিলেছে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১১ সালে ভারতের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের হার ছিল ২৬.৩ শতাংশ। ২০১৯ সালে সেই হার কমে দাঁড়িয়েছে ১১.৬ শতাংশ। অর্থাৎ আট বছরে দেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনসংখ্যার হার ১৪.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরেও কমেছে দরিদ্র জনসংখ্যা। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, ২০১১ সালে ভারতে দারিদ্র্যের হার যেখানে ১৪.২ শতাংশ ছিল, ২০১৯ সালে তা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৬.৩ শতাংশে। অর্থাৎ গত আট বছরে প্রায় আট শতাংশ গরিব কমেছে দেশের শহরাঞ্চলেও।

বলা বাহুল্য, এই পরিসংখ্যান কিন্তু কোভিড-পূর্ব পরিস্থিতিতে। অর্থনীতিবিদরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, কোভিডের সময় গোটা বিশ্বেই অর্থনীতির অবস্থা করুণ। বিশ্বব্যাংক এও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের বেঁচে থাকাই এর ফলে কষ্টকর হয়ে উঠবে। এবং আরও বহু মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাবেন। কিন্তু সারা বিশ্বে এই পরিস্থিতি দেখা দিলেও, ভারতে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের ক্ষেত্রে সমস্যা এতটা প্রকট হয়নি। কারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতি।

ভারতে তখনও করোনা মহামারী পুরোপুরি থাবা বসায়নি। তার আগেই কোভিডের সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করে কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় একগুচ্ছ সুযোগ সুবিধার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। যার মধ্যে বিনামূল্যে রেশনের সুবিধাও ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোভিড পরিস্থিতিতে এই সুযোগ দেশের গরিব মানুষকে অনেকদিন দিয়ে গিয়েছে এবং এখনো ক্ষেত্রবিশেষে দিচ্ছে।

শুধু বিনামূল্যে রেশনই নয়, জনধন যোজনায় যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, এমন কুড়ি কোটি মহিলাকে বেশ কয়েকমাস পাঁচশো টাকা প্রতি মাসে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তারপর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বিমা কোভিড যোদ্ধা ও ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের জন্য। মনরেগার পারিশ্রমিক দিনে ১৮২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে উপকৃত হন প্রায় ১৩.৬২ কোটি পরিবার। তিন কোটি গরিব বৃদ্ধ, বিধবা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য এককালীন হাজার টাকা দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়। কৃষকদেরও প্রধানমন্ত্রী কৃষক যোজনায় ২০২০ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দু' হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের জন্য আলাদা তহবিল গড়তে সচেষ্ট হয় কেন্দ্র, রাজ্যগুলিকে এই মর্মে নির্দেশও দেওয়া হয়। ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় কেন্দ্রীয় বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা।

> গ্লোবাল হ্যাপি ইনডেক্স-এ অর্থাৎ বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে সুখী মানুষের সূচকের নিরিখে ভারত ক্রমাগত পিছচ্ছে বলে যে প্রচার করা হয়, জানা নেই গ্লোবাল হ্যাপি ইনডেক্স নির্ণয়ের মাপকাঠি কী, কিন্তু এর বাস্তব ভিত্তি যে যথেষ্ট দুর্বল তা নিশ্চয়ই ভারতে দারিদ্র্য কমার পরিসংখ্যানের পর বলে দিতে হবে না।

মূলত ভারত সরকারের এই অর্থনৈতিক সতর্কতার কারণে সারা বিশ্বে মহমারী-জনিত যে আর্থিক ধস নেমেছে, ভারতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্তত তার থেকে কম। অর্থনীতিজ্ঞরা এও মনে করেন, এদেশের অর্থনীতির সামনে বাধা প্রধানত দুটি। প্রথমত, দারিদ্র্য, দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে মোদী সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই দুটি বিষয় দুরীকরণে সচেষ্ট। এইবার আসতেই হয় রাজনীতির কথায়। বিরোধীরা গোয়েবলসীয় নীতি অনুসরণ করে গত সাত-আট বছরে নীরব মোদীর সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদবিগত মিল নিয়ে ইত্যাদি আরও কিছু ব্যাপারে ক্রমাগত কটাক্ষ করে এসেছে। কৃষক-দরদি সেজে নিরীহ কৃষিজীবী মানুষকে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে। কিন্তু ভারত সরকারের অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার স্বীকৃতির সাক্ষ্য এখন খোদ আন্তর্জাতিক স্তরেও।

এই পরিসংখ্যান আর একটি বাস্তবকেও জনসমক্ষে উন্মোচিত করলো। গ্লোবাল হ্যাপি ইনডেক্স-এ অর্থাৎ বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে সুখী মানুষের সূচকের নিরিখে ভারত ক্রমাগত পিছচ্ছে বলে যে প্রচার করা হয়, জানা নেই গ্লোবাল হ্যাপি ইনডেক্স নির্ণয়ের মাপকাঠি কী, কিন্তু এর বাস্তব ভিত্তি যে যথেষ্ট দুর্বল তা নিশ্চয়ই ভারতে দারিদ্র্য কমার পরিসংখ্যানের পর বলে দিতে হবে না। ■

বেঙ্গল ভায়োলেন্স : ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রকৃতি ইসলামীয়

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

এমত দাবি বিতর্ক সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। তাই এর সপক্ষে পাঠকের কাছে পেশ করব এমন কিছু তথ্য যেগুলিকে এমত হাইপোথিসিসের ভিত্তি বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গের ভোট-পরবর্তী হিংসার প্যাটার্ন থেকে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় এটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ভোটদাতাদের প্রতি এমন এক জিঘাংসা যাকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক হিংসা আখ্যা দিলে ঘটনার অভিঘাত স্পষ্ট হয় না। পশ্চিমবঙ্গের ভোট- পরবর্তী হিংসাকে 'রাজনৈতিক হিংসা'র গণ্ডিতে ফেলার উদ্যোগটিও আদতে প্রকৃত ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর প্রয়াস বলে প্রতীত হয়, যদিও তা সচেতন প্রয়াস না-ও হতে পারে। বেঙ্গল ভায়োলেন্সের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার পথে অন্তরায় এদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বভাবসিদ্ধ অসংবেদনশীল মানসিকতা। যে কোনো হিংসাই তাঁদের পরিভাষায় 'রাজনৈতিক হিংসা'। কিন্তু 'রাজনৈতিক হিংসা' শব্দবন্ধটি যে অভিঘাত জনমানসে সৃষ্টি করে, বেঙ্গল ভায়োলেন্সের ভয়াবহতা তার বহুগুণ অধিক ও বেনজির।

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আকচাআকচি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু সিএফজে-র রিপোর্ট এবং জিআইএ-র ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির রিপোর্ট অধ্যয়ন করে মনে হয়েছে, বেঙ্গল ভায়োলেন্স কেবল 'রাজনৈতিক হিংসা' নয়। যে জিঘাংসা চরিতার্থ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ভোটের ফল বেরোনোর পর, তা অস্বাভাবিক এবং এর পিছনে আদত কারণটি গূঢ় ও ভয়াবহ।

নির্বাচনোত্তর হিংসা এ রাজ্যে নিয়েছে যুদ্ধপরবর্তী হিংসার বর্বর রূপ। প্রথমত, গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে যুদ্ধ ভেবেছেন যাঁরা, তাঁরা আদতে মানেননি ভারতের সংবিধানের মূল স্পিরিটকেই। এ যদি যুদ্ধ না হয়ে শুধু ভারতীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনই হতো, তবে নির্বাচন-উত্তরকালে মহিলাদের টার্গেট করা হতো না। ঐতিহাসিক তথ্যের আধারে তুলনামূলক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, এমত বর্বরতা ইসলামীয় বৈশিষ্ট্য। নচেৎ মহিলাদের প্রতি যে ধারার আক্রমণ হয়েছে, সে আক্রমণকে অন্য কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। আক্রমণের এই ধারা ভারতীয়ত্বের ধারণার পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে তো নয়ই, এমনকী ভারতীয় যুদ্ধনীতিতেও মহিলাদের আক্রমণ করা নীতি ও রীতি বিরুদ্ধ। অথচ যুদ্ধে বিজিত পক্ষের মহিলাদের গণিমতের মাল বলে গণ্য করার রীতি ইসলামীয় যুদ্ধনীতিতে অনুমোদিত। এ থেকে অনুমান করা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে ২০২১-এর নির্বাচনকে যুদ্ধের রূপ দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ইসলামীয় লবি এবং ভোটে জেতাকে 'যুদ্ধজয়' বলে ধরে নিয়ে বিজিত দলের হিন্দু মহিলাদের 'লুটের সামগ্রী' মনে করেছে তারা। ইসলামীয় আক্রমণ পদ্ধতি ভারতীয় সভ্যতার রীতিনীতিকে লঙ্ঘন করে জান্তবতার পথ ধরেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের এক বড়ো অংশ সংস্কৃতিগতভাবে আজও ভারতীয় হয়ে উঠতে পারেনি। বেঙ্গল ভায়োলেন্সের মোডাস অপারেন্ডি তার পরোক্ষ প্রমাণ। তবে পশ্চিমবঙ্গের ভোট-পরবর্তী হিংসায় সাংস্কৃতিক ভারতীয়ত্বের সীমাই শুধুমাত্র লঙ্ঘিত হয়নি, ভারতীয় সংবিধানের মূল স্পিরিটকে ধ্বস্ত করার মাধ্যমে হয়েছে সংবিধান-অবমাননাও।

পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসায় শ্লীলতাহানি হয় প্রায় ৭০০০ মহিলার। এ বঙ্গভূমি এককালে হীরু ডাকাত, বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাতদের দাপটক্ষেত্র। তারা মহিলাদের গয়না লুঠ করত, কিন্তু তাঁদেরকে ধর্ষণ করার কথা সুদূর কল্পনাতেও স্থান দিত না। মা কালীর পূজারি বাঙ্গলার এই ডাকাতরা মায়ের পায়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নরবলি দিতে পারত, কিন্তু মহিলাদের যৌন নিপীড়ন করার কথা ভাবতে পারত না। আজ এই একুশ শতকে এসে সেই বাঙ্গলার সংস্কৃতি ম্লেচ্ছমলিন হয়ে উঠেছে।

বেঙ্গল ভায়োলেন্সের প্রকৃতি ইসলামীয়— এমত তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ এই যে, নারীর যোনীপথকে যুদ্ধক্ষেত্র বানানোর প্রক্রিয়া ইসলামি শাসনাধীন ভারতবর্ষ দেখলেও, বিভাজন-উত্তর ভারতবর্ষ দেখেনি। অবাধ গণধর্ষণ, ধর্ষণ ও যৌনলাঞ্ছনা তাই নিছক রাজনৈতিক হিংসার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে না। নারীধর্ষণ যাদের জীবনধারার অঙ্গ, মাতৃপূজনের মহিমা তারা বোঝেনি। ২০২১ সালের বেঙ্গল ভায়োলেন্স তাই ভারতীয়ত্বের চিরায়ত ধারণার পরিপন্থী। রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের ট্রাডিশনের অঙ্গ। কিন্তু নারীর এমত অবাধ ও সুপরিকল্পিত যৌনলাঞ্ছনা বিভাজন-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ তথা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ দেখেনি। বেঙ্গল ভায়োলেন্সের প্রভাব তাই সুদূরপ্রসারী। এর মূল্য চোকাতে হবে গোটা ভারতবর্ষকে।

বেঙ্গল ভায়োলেন্সের অপর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। মহিলাদের প্রতি অসংখ্য যৌন নির্যাতনের কেসে হাতে গোনা সামান্য কটিতে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। এবং সেই কটি এফআইআর-এর অধীনে যে কজন অভিযুক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে মাত্র চার শতাংশ আততায়ীকে রাখা হয়েছে কাস্টডিতে আর বাকি প্রত্যেকেই রয়েছে মুক্ত। এ তথ্যের

ফঃ ২

ট্রাইবুলেশন ক্যালকাটা হাইকোর্টের রায়ের ৪৭ নম্বর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে যে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনকে কি অপরাধের তকমা দিতে চায়নি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ? নাহলে এমন অসংখ্য ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন মাত্র হাতে গোনা কটি কেসে অভিযোগ দায়ের করল তারা? ধর্ষণের স্বাভাবিকীকরণ করার প্রয়াস চলছে শাসকদল তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের তরফ থেকে? এ বৈশিষ্ট্য কদাচ ভারতীয় সভ্যতার নয়। ঐতিহাসিকতার প্রেক্ষাপটও চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে, এ জাতীয় আচরণ ইসলামীয়। মহিলাদের যৌনতাকে তাদের দুর্বলতা মনে করে সেখানেই আঘাত হানার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে ২০২১-এর ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনাগুলিতে, রাজ্যের প্রায় সর্বত্র, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের 'শায়েস্তা করার জন্য' এবং তাদের 'দমন করতে'। এমন ভাবা অসঙ্গত নয় যে আঘাত হানার এমত কৌশল ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত, যা কার্যকর করা হয়েছিল মূলত ফল বেরোনোর পর। যে ভারতভূমি মা কামাখ্যার পূজা করে, সে দেশ যে যৌনতাকে দুর্বলতা মনে করে না তা বলাই বাহুল্য। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নারীধর্ষণকারীরা কারা? অতি অবশ্যই ইসলামীয়রা এবং ইসলামীয়দের সংসর্গে বাস করা সেই ভাবধারার শিকার অমুসলমানরাও। অপরাধের ধরনের এই পরিবর্তন ক্যালকাটা হাইকোর্টের নজর এড়ায়নি। নির্বাচনী লড়াইয়ে বিজিত পক্ষের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলাদের মানসম্মানকে টার্গেট করার এমন অভারতীয়, কদর্য পদ্ধতি চরম অপ্রত্যাশিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ওয়াকিবহাল মানুষের মনে উস্কে দিয়েছে দেশভাগের ভয়াবহতার স্মৃতি।

২ মে'র পর থেকে মহিলাদের যেভাবে শিকার হতে হয়েছে যৌন আক্রমণের, ইসলামিক দেশগুলিতে তা স্বাভাবিক ঘটনা হলেও ভারতবর্ষের চিরায়ত প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে এমন কুৎসিত প্রতিহিংসা-প্রকাশ-পদ্ধতি নজিরবিহীন।

স্পষ্ট করে বললে— বেঙ্গল ভায়োলেন্স আদতে এ শতকের ভারত আক্রমণ। ভোটের লড়াইকে সামনে রেখে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বস্ত করার এক সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এই বেঙ্গল ভায়োলেন্স। পশ্চিমবঙ্গের প্রায়োন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে এ রাজ্যে ফের হয়ে গিয়েছে বৈদেশিক হামলা। (কল ফর জাস্টিস নামক সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনটির পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শেও উঠে এসেছে এ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য) সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপস্থিতি সে হামলাকে 'বৈদেশিক আক্রমণ' বলে চিহ্নিত করায় বাধা সৃষ্টি করছে। যাকে ভোট-পরবর্তী হিংসা বলে মনে হচ্ছে, তা আদতে যুদ্ধ-পরবর্তী লুটপাঠ। হিন্দু নারীদেহকে দখল করার মাধ্যমে এদেশের ওপর ভিন্ন সংস্কৃতির থাবা বাড়িয়েছে তারা।

বীরভূম হোক বা বর্ধমান, হাওড়া হোক বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বেঙ্গল ভায়োলেন্সের প্যাটার্নটি এক। দুষ্কৃতীরা টার্গেটের বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই নিশানা করেছে মহিলাদের এবং ভেঙেছে হয় টয়লেট নয়তো জলের অথবা ইলেকট্রিকের লাইন, কেড়ে নিয়েছে রেশন কার্ড, আধার কার্ডের মতো পরিচয়পত্রগুলি। অর্থাৎ যে পরিষেবাগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় সেগুলির বন্দোবস্তকে ধ্বংস করেছে তারা যাতে অত্যাবশ্যক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষগুলো বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় এবং তাদের ফেলে যাওয়া বাড়ি দখল করতে সুবিধা হয় দুষ্কৃতীদের। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মানুষকে ভিটে থেকে উৎখাত করে সে ভিটে দখল করতে যারা চাইছে, তারা মূলত কারা? বেঙ্গল ভায়োলেন্সের এমত ধরনটি পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফির অধিকতর পরিবর্তনের একটি সচেতন প্রয়াস বলে প্রতীত হয়। বেঙ্গল ভায়োলেন্স কেবলমাত্র দলীয় দ্বন্দ্ব নয়, বরং বৃহত্তর ইসলামীয় আগ্রাসনের প্লট।

টেলিভিশন চ্যানেলে অনেক সময় প্রশ্ন উঠেছে বেঙ্গল ভায়োলেন্স যে সাম্প্রদায়িক হিংসা, তার প্রমাণ কী? প্রমাণ পরোক্ষ। ধর্ষণ ও যৌনলাঞ্ছনার এমন প্রচণ্ড ব্যবহার এদেশের বৈশিষ্ট্য নয়। ভোট পরবর্তী হিংসায় ধর্ষিতা নারীদের নিরানব্বই শতাংশই হিন্দু। আততায়ীরা নানা স্থানে উত্তেজনার বশে বলেও ফেলেছে যে তাদের নিশানায় হিন্দু মেয়েরাই। কোনো পূর্ব পরিকল্পিত ছক না থাকলে রাজ্যের সর্বত্র এমত এক প্যাটার্ন পরিলক্ষিত হতে পারত না। বিধর্মী নারীকে ধর্ষণ ইসলামীয়দের ক্ষেত্রে অপরাধ নয়; ধর্মীয় কর্তব্য এবং একপ্রকার খেলা। রিপোর্ট অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসায় শ্লীলতাহানি হয় প্রায় ৭০০০ মহিলার। এ বঙ্গভূমি এককালে হীরু ডাকাত, বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাতদের দাপটক্ষেত্র। তারা মহিলাদের গয়না লুঠ করত, কিন্তু তাঁদেরকে ধর্ষণ করার কথা সুদূর কল্পনাতেও স্থান দিত না। মা কালীর পূজারি বাঙ্গলার এই ডাকাতরা মায়ের পায়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নরবলি দিতে পারত, কিন্তু মহিলাদের যৌন নিপীড়ন করার কথা ভাবতে পারত না। আজ এই একুশ শতকে এসে সেই বাঙ্গলার সংস্কৃতি ম্লেচ্ছমলিন হয়ে উঠেছে।

কল ফর জাস্টিস বিস্তারিতভাবে কাজ করেছে নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে জেলাগুলিতে মুসলমান ছেলেদের পরিচয় ভাঁড়িয়ে হিন্দু ঘরের মেয়েদের বিয়ে করার ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। যেসব মানুষ এই ধরনের ঘটনার ক্রমবর্ধমান ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, নির্বাচন-পরবর্তী অসুরক্ষিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে তাঁদেরও— রিপোর্ট করেছে সিএফজে। এ থেকেও পরোক্ষে স্পষ্ট হয় ভোট-পরবর্তী হিংসার ইসলামীয় এবং গূঢ়তর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রকৃতি। পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসা আদতে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের দুর্বলতাসমূহের সুযোগ নিয়ে একুশ শতকের ভারত আক্রমণ।

বহু গ্রামে প্রতিবেশী দেশ থেকে দল বেঁধে চলে আসা মানুষজন প্রচুর জমি, বাড়ি কিনে নিয়ে পুরোনো বাসিন্দাদের সেখান থেকে জোর করে উৎখাত করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতার মিস্ত্রিপাড়ায় মিস্ত্রি পদবির মানুষ বর্তমানে আছেন আর মাত্র এক ঘর। মিস্ত্রিপাড়ার বুথের ভোটার তালিকায় এ বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করবে। মিদ্যাপাড়ায় মিদ্যা বা মিদ্দ্যেদের সংখ্যাও হাতে গোনা, আর ক্রমেই বেড়েছে মুসলমান জনসংখ্যা। অথচ জায়গার নাম থেকেই স্পষ্ট যে এমত পাড়াগুলিতে আদতে ছিল মিদ্যা, মিস্ত্রিদের বাস। যে সব গ্রামবাসী এমত ডেমোগ্রাফি পরিবর্তনের প্রতিবাদ ভোটের আগে করেছিলেন, ভোট-পরবর্তীকালে চরম হিংসার কবলে পড়তে হয় তাঁদেরও। ফলতার বুথ নং ২০৫-এর অরিন্দম মিদ্দ্যেকে মেরে তালিবানি কায়দায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় গাছে। অরিন্দম ছিলেন বিজেপির বুথ এজেন্ট এবং তাঁর বুথে জয়লাভ করেছিল বিজেপি। এই সমস্ত ঘটনাবলীর পূর্ণ ও ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে পশ্চিমবঙ্গের ভোট-পরবর্তী হিংসা কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রক্তক্ষয় নয়।

হিংসার শিকার হওয়া মানুষদের অনেকের থেকেই জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের আধার কার্ড ও রেশন কার্ড। বিষয়টি

ভীতিপ্রদ ও তাৎপর্যপূর্ণ। যেসব মানুষ প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন, তাঁদের আধার কার্ড ও রেশন কার্ড যদি পরিচয় একই রেখে অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের আদত অধিবাসীদের জায়গায় এসে ঢুকবে অন্য লোক। নাম, বাড়ি, পরিচয় বদলাবে না, কিন্তু বদলে যাবে লোকগুলি। নতুন দখলদাররা যদি ভিন্ন ধর্মেরও হয়, তথাপি প্রথমে এ রাজ্যের আদত অধিবাসীদের নাম ও পরিচয় গ্রহণ করে এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ার পর একটিমাত্র এফিডেভিটের মাধ্যমে নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করে তাদের আদত পরিচয়ে ফিরে গেলেই এদেশের দখলিকৃত সম্পত্তি রেট্রসপেক্টিভ এফেক্ট-সহ তাদের হয়ে যাবে এবং উৎখাত হয়ে যাবেন ওই সকল সম্পত্তির আদত মালিকরা অর্থাৎ এ রাজ্যের আদত অধিবাসীরা। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের যেভাবে উৎখাত করতে পারা গিয়েছিল প্রাক্-সোশ্যাল মিডিয়া যুগে, বর্তমান সময়ে এসে এ রাজ্যের হিন্দুদের উৎখাত করতে এই প্রকার ধূর্ত জালিয়াতির উদ্যোগ নেওয়া আততায়ীদের পক্ষে সম্ভব। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এমন জালিয়াতি এ রাজ্যে অসম্ভব নয়। প্রাক্তন আইএএস, আইপিএস, বিচারপতিদের নিয়ে প্রস্তুত কল ফর জাস্টিসের তদন্তকারী কমিটির রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের আমলাদের যেভাবে তুলোধোনা করা হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে এমন সন্দেহ আদৌ অযৌক্তিক নয় যে আধার কার্ড জালিয়াতিতে অংশগ্রহণ করবে কেবল দুষ্কৃতীরা নয়, এমনকী পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনও। আধার কার্ড ও রেশন কার্ড কেড়ে নেওয়া পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফির আরও খানিক পরিবর্তনের দুষ্ট ছক হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এ রাজ্যের ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তনে লাভ যেহেতু ইসলামীয়দের, সেহেতু এমত দুরভিসন্ধিমূলক কাজের পিছনেও সন্দেহের নিশানায় তারাই।

আরও বেশ কিছু এমন বিষয় আছে, যা পরোক্ষে প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসার প্রকৃতিটি ইসলামীয়। সিএফজে-র রিপোর্ট অনুসারে হিংসা কবলিত হয়ে পড়ে রাজ্যের প্রায় ষোলোটি জেলা। সর্বত্রই আততায়ীরা আক্রমণ করেছে সাধারণত রড, ভোজালি, ছোরা, কাঁচা বোমা এবং অবশ্যই পাথর নিয়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। পাথর ছোঁড়া ভারতের কোনো আক্রমণ পদ্ধতি নয়, বরং ইসলামের ধর্মীয় রীতি। পশ্চিমবঙ্গের ভোট-পরবর্তী হিংসায় অবাধ পাথর ছোঁড়ার ঘটনা হিংসার ইসলামীয় প্রকৃতির পরোক্ষ নির্দেশক।

জিআইএ-র ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি যে চল্লিশাধিক ধর্ষিত, গণধর্ষিত, যৌনলাঞ্ছিত ও ধর্ষণের হুমকিপ্রাপ্ত মহিলার আবেদনপত্র মানবাধিকার কমিশনের কাছে পেশ করেছে, সেই আবেদন পত্রগুলির অধ্যয়নে যে তথ্য উঠে আসে তা হলো— যে সকল ক্ষেত্রে আক্রমণকারী আততায়ীদের মধ্যে এক বা একাধিক মুসলমানের উপস্থিতি ছিল, সেই সব মহিলা নৃশংসভাবে ধর্ষিতা অথবা গণধর্ষিতা হয়েছেন। হিন্দু আততায়ীদের উপস্থিতিতে মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও যৌন নিপীড়ন যতখানি হয়েছে, ধর্ষণ তত হয়নি। হিন্দু আততায়ীরা বার বার হামলা চালিয়েছে কিছু কিছু এলাকায়, অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছে মহিলাদের, জামাকাপড় টেনে খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ধর্ষণকাণ্ডে মুসলমানদের থেকে পিছিয়ে ছিল তারা। মুসলমান আততায়ীরা যতখানি নির্বিচারে ধর্ষণ করতে পেরেছে, হিন্দু আততায়ীরা তত অবলীলায় ধর্ষণ করতে পারেনি। বার বার হামলা চালিয়েছে তারা এবং ভাঙচুর ও ক্ষয়ক্ষতির তাণ্ডব করেছে বেশি। প্রতিটি কেস আলাদা আলাদাভাবে স্টাডি করলে আন্দাজ করা যায় যে তৃণমূলের হিন্দু নেতাকর্মীরাও হামলা চালিয়েছে মুসলমান মাফিয়াদের নেতৃত্বে। কোনো কোনো এলাকায় আক্রমণকারীরা হিন্দু হলেও তাদের সঙ্গে পাঠানো হয়েছে একদল পরিচিত দুষ্কৃতী বাহিনীকে। আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে অনেকেই বয়ান দিয়েছেন যে ভয়ংকর আক্রমণের মুখে পরিচিত স্থানীয় হিন্দু তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দেখতে পাওয়ার পাশাপাশি তিরিশ চল্লিশ জনের দুষ্কৃতীদলকেও দেখেছেন তাঁরা যারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। আন্দাজ করা অযৌক্তিক নয় যে এই প্রকার অপরিচিত গুন্ডাবাহিনীর অধিকাংশই মুসলমান এবং অনুপ্রবেশকারী হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। বেঙ্গল ভায়োলেন্সের বিচার প্রক্রিয়া যদি ভায়োলেন্স- ভিকটিমদের মতো বিচার দিতেও পারে, সেক্ষেত্রেও এই বিপুল পরিমাণ অপরিচিত গুন্ডাবাহিনীর হদিশ পওয়া যাবে বলে মনে করি না।

প্রকৃত ন্যায়বিচারের জন্য তাই বিভিন্ন এলাকার মাফিয়াদের দণ্ডিত হওয়া আদতে প্রয়োজন যারা এইসব অপরিচিত গুন্ডাবাহিনীর পোষক ও পরিচালক। এমত ক্রিমিনাল মাফিয়াদের অনেকের নামই মুখবন্ধ খামে সিএফজে-র তরফ থেকে জমা পড়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে।

গড়বেতার কাজল নন্দী, মিনাখাঁর পিঙ্কি বাজ, বেজরার চন্দ্রিমা মিস্ত্রি, ডায়মন্ডহারবারের পৃথ্বীশ নস্করের (মা ও দিদিকে নিয়ে) মতো আরও অনেককে বাড়ি ছেড়ে পালাতেই হয়েছে মানসম্ভ্রম রক্ষা করতে। কারণ এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই মুখ্য আক্রমণকারীরা ছিল মুসলমান। এরা না পালালে এদের ধর্ষিত হতে হতো নিশ্চিতভাবে। যেসব মহিলা ধর্ষিতা ও গণধর্ষিতা হয়েছেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুখ্য আততায়ীরা ব্যতিক্রমহীনভাবে মুসলমান। অপরপক্ষে, বহু মহিলা ভয়ংকরভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েও ভয়ে আতঙ্কে পাথর হয়ে বাস করতে পেরেছেন নিজেদের বাসগৃহে। অধ্যয়ন করে দেখেছি, এইসব মহিলা আক্রান্ত হয়েছেন মূলত হিন্দু আততায়ীদের দ্বারা, মুসলমানদের নজরদারিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাওড়া ডোমজুড়ের নিরুপমা হাজরা বা সবিতা দাসের বাড়িতে আততয়ীরা ঢুকে নির্মমভাবে মারধর করে বাড়ির পুরুষ ও মহিলাদের, লুঠপাঠ ও অশ্রাব্য গালিগালজ করে, হাত ভেঙে দেয় নিরুপমার মায়ের, আর নিরুপমাকে হুমকি দিতে থাকে 'বেরিয়ে আয়, নয়তো মুসলমানদের দিয়ে তোকে রেপ করিয়ে দেব।' অর্থাৎ এক্ষেত্রে আক্রমণকারী আততায়ীদের মধ্যে নজরদারির দায়িত্বে মুসলমান থাকলেও আক্রমণের নেতৃত্বে মুসলমানরা ছিল না, অথচ হিন্দু নারী ধর্ষণের কাজটি মুসলমানদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের ভোট-পরবর্তী হিংসা আদতে মুসলমান-নেতৃত্বাধীন হওয়ার অপর একটি পরোক্ষ প্রমাণ এটি।

পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘাদাঁড়ির মাতঙ্গিনী বেরাকে আক্রমণ করেছিল জনা পনেরো মুসলমান গুন্ডাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মিহির ভৌমিক, উৎপল জানা, দিলীপ পাত্র, নিবারণ জানা, শিবকান্ত, নবকান্ত, সুজিতরা। মাতঙ্গিনীর পুত্রবধূ ছিল তাদের প্রাথমিক নিশানা। মাতঙ্গিনী বাধা দেওয়ায় তাঁকে রড দিয়ে মারে তারা। ঘরদোর তছনছ করে লুঠ করে গয়নাগাটি, টাকাপয়সা। এক্ষেত্রেও প্যাটার্নটি এক। নেতৃত্বে এবং নজরদারির দায়িত্বে থেকেছে মুসলমানরা, ধর্ষণের কাজটি করার পরিস্থিতি তৈরি হলে করেছে মূলত মুসলমানরা আর দৈহিক নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির কাজগুলি অনেকাংশেই করিয়ে নেওয়া হয়েছে হিন্দু আততায়ীদের দিয়ে মুসলমানদের নজরদারিতে। ▯

স্বাধীনতা সংগ্রামে শিক্ষকদের ভূমিকা বর্তমানে উন্নত ভারত গড়তে প্রেরণা জোগাবে

তৎকালীন সময়ে, শিক্ষক সমাজ তাদের কঠিন ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তারা নিজেরাই ছিলেন তরুণদের কাছে আদর্শ। এখন সময় এসেছে আজকের শিক্ষকের ভূমিকা ও কাজ সম্পর্কে পুনর্জাগরণের।

সাধন কুমার পাল

পরাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষকেরা শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেননি, বিপ্লবী আন্দোলনের বেশিরভাগই শুরু হয়েছিল স্কুল প্রাঙ্গণ থেকেই। সেই সময়গুলি ছিল যখন বিপ্লবী চেতনা প্রায় প্রতিটি নাগরিকের রক্তে ছিল। শিক্ষকদের একাংশ তাদের ছাত্রদের সংগ্রামে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল, একাংশ স্কুল প্রাঙ্গণের বাইরে থেকে বিপ্লবী কাজকর্মে সহায়তা করেছিল। আবার অনেকেই সরাসরি সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে দেশমাতৃকার চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিল। অন্যরা ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রবীন্দ্রনাথের মতো লোক-শিক্ষকেরা যেমন সমাজে স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়েছেন তেমনি মাস্টারদা সূর্য সেন, বালগঙ্গাধর তিলক, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ভগিনী নিবেদিতার মতো শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রত্যক্ষ ভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বেণীমাধব দাসের মতো শিক্ষকেরা বিপ্লবী তৈরির কারিগর হয়ে উঠেছিলেন। একজন সৎ, নির্ভীক, আপোশহীন দেশপ্রেমিকের মতো গুণাবলী অর্জন করে সুভাষচন্দ্র বসুর 'নেতাজী' হয়ে ওঠার পেছনে যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস। তখন এলিট বাঙ্গালি সমাজে ইংরেজদের অধীনে উঁচু পদের চাকরিকেই সম্মানজনক কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো। সুভাষচন্দ্রের মামা বিনোদচন্দ্র মিত্র ছিলেন বাঙ্গলার অ্যাটর্নি জেনারেল। ছোট্ট সুভাষ স্বপ্ন দেখতেন, বড়ো হয়ে মামার মতো পদাধিকারী হবেন অথবা আইসিএস হবেন। র‍্যাভেন'শ কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস সুভাষের চিন্তাভাবনা পালটে দিলেন। এতদিন সুভাষের ইংরেজ সরকারের আজ্ঞাবাহক কোটপ্যান্ট পরিহিত নকলনবিশ কর্মচরীদের প্রতি যে অন্ধভক্তি ছিল তাঁর সংস্পর্শে এসেই তা এক ঝটকায় উবে গেল। ছোটোবেলা থেকেই সুভাষ কোটপ্যান্ট পরে স্কুলে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও, বেণীমাধবের অনুসরণে সুভাষ ধুতি ও জামা পরে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিলেন। বেণীমাধববাবুই সুভাষকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করতে, কৈশোরের অস্থির সময়ে যা সুভাষকে জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

স্বদেশি যুগে শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে স্বদেশী উদ্যোগগুলি মূলত বাঙ্গলার নবজাগরণের কাণ্ডারিদের হাত ধরে অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ফল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। স্বদেশি যুগের চিন্তাবিদদের শিক্ষা পশ্চিমি শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে হলেও তাঁদের হাত ধরেই স্বদেশি শিক্ষাব্যবস্থার এক ব্যতিক্রমী বিস্তার ঘটেছিল। হিন্দু কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এর সাক্ষ্য বহন করে। রাজা রামমোহন রায় মেকলে মিনিটের এক দশকেরও বেশি আগে ইংরেজি শিক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। শহরতলির বুদ্ধিজীবীরা চার্লস উডের গ্রান্ড-ইন-এইড নীতি ব্যবহার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক মধ্যম ও উচ্চ ইংরেজি স্কুল এবং বেসরকারি কলেজ স্থাপন করলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা স্বদেশি আন্দোলনের একটি প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। মূলত দুটি ধারা নিয়ে এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। সরকারি স্কুল ও কলেজ বয়কটের আহ্বান এবং জাতীয় শিক্ষার একটি সমান্তরাল ও স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

স্বদেশি দিনগুলিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার

বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযোগ ছিল যে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল মূলত ভারতীয় ছাত্রদের তাদের জাতীয়তাবোধের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভারতের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের ব্যাপারে তাদের মনে ঘৃণার ভাব তৈরি করার জন্য। যাতে এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা বিদেশি শাসকদের দাস এবং পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণকারী হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য জাতীয়তাবাদী ভাবনায় এবং ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা স্বদেশি আন্দোলনের বড়ো উদ্যোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের উদ্যোগের অভাব ছিল না। উপনিষদিক প্রশিক্ষণের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, ১৮৪৫ সালে শিক্ষা প্রসারের নামে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাঁর উদ্যোগে হিন্দু হিতৈষী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৭০ সালে নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল স্কুল, ১৮৭০-এর দশকে কলকাতায় ব্রাহ্মদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজ এবং শহরের আশেপাশে অসংখ্য স্কুল এবং ১৮৮০-এর দশকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম স্কুল, সতীশ চন্দ্র মুখার্জির ভাগবত চতুঃস্পাঠী (১৮৯৫), বোলপুরের কাছে রবীন্দ্রনাথের আশ্রম (১৯০১) গড়ে উঠেছিল। ভাগবত চতুঃস্পঠীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বিনা বেতনে অভিজাত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সমস্ত আগ্রহী ছাত্রকে হিন্দু ধর্মীয় দর্শন ও শাস্ত্র অধ্যয়নে সহায়তা করা। যাতে হিন্দু দর্শন অনুসারে প্রাচীন গুরুগৃহবাসের আদর্শ অনুসরণ করে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবন গড়ে তোলা যায়। সতীশ চন্দ্র পড়ুয়াদের শিক্ষা আধুনিক জীবনোপযোগী করার জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রচলনও করেছিলেন। স্বদেশি আমলে পশ্চিমের ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান ও টোল শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তনের কথা মাঝেমধ্যেই শোনা যেত। স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'য় (২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫) লেখা হলো স্বদেশি বিদ্যালয়গুলিতে আর্য জ্ঞান অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। কিন্তু বাস্তবে এই ধরনের ভাবনার গুরুত্ব খুবই কম ছিল কারণ অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির জাতীয়তাবাদীরাও সাধারণত আধুনিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারছিলেন না।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন মানুষ রবীন্দ্রনাথের মতো পাশ্চাত্যের অন্ধ বিরোধী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ছিল মূলত প্রচলিত শহুরে বিদ্যালয়ের কারখানার মতো পরিবেশের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতি থেকে শিশুদের শেখার সুযোগ দেওয়া উচিত, যেখানে ঋতুর ছন্দ এবং তারার আলো তাদের যে কোনও প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক বা ক্লাস লেকচারের চেয়ে আরও ভালো শিক্ষা দেবে। আমাদের মতো একটি দরিদ্র দেশে প্রাচীন ভারতের আশ্রম আদর্শ যেখানে গুরু ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং সহজ সরল শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁকে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতের ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থার প্রতিও টান ছিল প্রবল।

আশ্রমের প্রথম দিনগুলিতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এই বক্তব্যের সমর্থনে বড়ো উদাহরণ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই প্রভূত লেখালেখি করেছেন, সেগুলোর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধটি ১৯০৪ সালে তিনি দুবার যথাক্রমে মিনার্ভা ও কার্জন হলে পাঠ করেন, পরবর্তীকালে একটি পরিশিষ্ট-সহ প্রবন্ধটি আত্মশক্তি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বদেশী, পল্লীসংস্কার এবং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচিতে এই প্রবন্ধের স্পষ্ট অনুপ্রেরণা ছিল। এই প্রবন্ধে উল্লেখিত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের প্রধান নেতাদের যেমন, অরবিন্দ, দেশবন্ধু বা গান্ধীজীকে পরবর্তীকালে চিন্তাভাবনা করতে দেখা যায়।

প্রবন্ধের শুরুতে তিনি সুস্পষ্টভাবে লিখছেন : 'আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই— কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।'

...'ইউরোপের যেখানে বল, আমাদের সেখানে বল নহে। ইউরোপ আত্মরক্ষার জন্য যেখানে উদ্যম প্রয়োগ করে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সেখানে উদ্যমপ্রয়োগ বৃথা। ইউরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার। সেই স্টেট দেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে— স্টেটই ভিক্ষাদান করে, স্টেটই বিদ্যাদান করে, ধর্মরক্ষার ভারও স্টেটের উপর। অতএব এই স্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সরল কর্মীষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়। আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।' আজকের দিনেও এই বিষয়গুলি সম্ভবত অধিকতর গুরুত্ব দাবি করে।

রবীন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্রের মতো পুরুষদের কাছে জাতীয় শিক্ষার ধারণার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। এটি তাদের গঠনমূলক স্বদেশি দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হলেও এর স্বায়ত্তশাসিত ভাবনা সরাসরি বিদেশি শাসকদের বিরোধিতারই রূপ ধারণ করেছিল এবং কর্মসূচিতে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের জঙ্গি স্লোগান রাজনৈতিক প্ররোচনা হিসেবে কাজ করছিল। সেই প্ররোচনাটি অবশ্যই কার্জনের ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া থেকে এসেছিল।

মেকলের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল একটাই,

অনুগত শিক্ষিত দেশীয় প্রজা সৃষ্টি যাদের ওপরে ভর করে এদেশের ঔপনিবেশিক শাসন স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে। এই শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে এদেশের ছাত্রদের পরিচয় ঘটলেও, সেই যোগাযোগে প্রাণের ছোঁয়া ছিল না। তাছাড়া, ওই বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার, দর্শনের কোনো যোগাযোগই ছিল না।

এছাড়া শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে ইংরেজিকেই বেছে নিয়েছিল। ফলে শিক্ষা সর্বজনীন না হয়ে মুষ্টিমেয় মানুষের জীবনজীবিকার উপকরণ হয়ে উঠেছিল। ঠিক একই ভাবে ইংরেজদের প্রশাসনিক কাজ করার উপযুক্ত কর্মচারী তৈরি করার আগ্রহ যতটা ছিল সাহিত্য বা ভাষাশিক্ষার সাহায্যে একজন সৃজনশীল মানুষ গড়ে তোলার আগ্রহ একাংশও ছিল না। শাসকের ভাষায়, শাসকের দৃষ্টিতে ইতিহাস থেকে বিজ্ঞান সবকিছু শেখানো হতো বলে দেশীয় ভাষা সংস্কৃতির চর্চা কমে যাচ্ছিল। তাতে ইংরেজের অনুগত কেরানি তৈরির চেষ্টা সফল হলেও, সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার অসম্ভব হয়ে পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অসম্পূর্ণতা, ভাষা শিক্ষার দুর্বলতা, ভারতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় জানার সুযোগ না থাকা এবং শিক্ষার জন্য সাধারণের খরচ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান অনাগ্রহ, মূলত এই সমস্ত কারণে জাতীয় নেতৃত্ব ও ভারতীয় শিক্ষাবিদরা পাশ্চাত্য শিক্ষার বদলে জাতীয় শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এজন্য স্বদেশি আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-১৯১১) বাঙ্গলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পৃথক শিক্ষানীতি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বড়োলাট কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদিঘির গোলামখানা' বলে ব্যঙ্গ করে ছাত্রদের এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার আহ্বান জনান। কারণ, গোলদিঘির কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ব্রিটিশদের অফিস-আদালতের জন্য কেরানি তৈরি করত। বিদেশি শিক্ষানীতির ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন দেশীয় শিক্ষাদরদি ব্যক্তিরা এই সময় বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে স্বদেশি ধাঁচের একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় বাঙ্গলায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম রংপুরে জতীয় বিদ্যালয় (৮ নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রি.) স্থাপিত হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর পার্কস্ট্রিটে প্রায় ১৫০০ প্রতিনিধি নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করে স্বদেশি শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এরপর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ৯২ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে ওঠে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল— জাতীয় আদর্শ অনুসারে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা দান করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশসেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলা, নৈতিক শিক্ষা দান করা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধনাঢ্য লোকেরা শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। এই পরিষদের অধীনে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৫ আগস্ট) 'বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় কুমার সরকার, সখারাম গণেশ দেউস্কর, প্রমুখ এখানে শিক্ষকতা করেছেন। এই পরিষদের প্রেরণায় বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠে।

বিভিন্ন ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি নিযুক্ত হন রাসবিহারী ঘোষ। ব্রিটিশ সরকার বাঙ্গলার জাতীয় শিক্ষার প্রসারকে সুনজরে দেখেনি। জাতীয় শিক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রদের সরকারি চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আর্থিক সংকট বাধা হয়ে দাঁড়ালেও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে যে প্রয়াস দেখা দিয়েছিল তার গুরুত্ব মোটেই কম নয়।

এই সব আলোচনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনের দীপ প্রজ্বলিত করেছিলেন দেশের তৎকালীন শিক্ষকরা। বেশিরভাগ শিক্ষকই স্কুল, কলেজ এবং অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বাইরে তাদের আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের ছাত্রদের দেশপ্রেমের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। সমগ্র সমাজকে এবং বিশেষ করে ছাত্রদের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য উদ্দীপ্ত করেছিলেন। শিক্ষকরা বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্তরে পৃথকভাবে এবং সম্মিলিতভারে শিক্ষার্থীদের স্বশাসন, স্ব-স্বাধীনতা এবং আত্ম-জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হতেন। বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, কবি, দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলতে ও মুক্তির জন্য জেগে উঠতে। বিশেষ করে বাঙ্গলায় শিক্ষকরা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠা করেন যা সারা বাঙ্গলায় শিক্ষা আন্দোলনের রূপ নেয় পরে যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

অবশেষে এটি দেশে একটি বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে রূপ পেয়েছে। সে সময় শিক্ষকরা ছাত্র-জনতার মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার আগুন প্রজ্বলিত না করলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন খুবই কঠিন হতে পারত। তৎকালীন সময়ে, শিক্ষক সমাজ তাদের কঠিন ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তারা নিজেরাই ছিলেন তরুণদের কাছে আদর্শ। এখন সময় এসেছে আজকের শিক্ষকের ভূমিকা ও কাজ সম্পর্কে পুনর্জাগরণের। দেশের তৎকালীন শিক্ষকদের পেশাগত নৈতিকতা আজকের শিক্ষককে একটি উন্নত দেশ হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলার জন্য সমাজে তাদের অবস্থানকে অনুকরণ যোগ্য করে তুলতে সহায়তা করতে পারে। □

মধ্য প্রাচ্যে ভারতীয়দের অবস্থা কেমন?

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

হাল আমলের ফ্যাশন হলো মিডল ইস্টে মানে মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলিতে ভারতীয়দের কাজের সন্ধানে বা বেড়াতে যাওয়া। সেখানে নাকি অঢেল সুখ! কী সুখ সেখানে?

ভারতীয় ও অন্য এশীয় লোকেদের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মধ্য প্রাচ্যে পাড়ি জমাতে প্রলুব্ধ করা হয়; এদের জন্য অনেক দালাল চক্র আছে; তারপর নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে তাদের বা তাদের পরিবারের প্রতি ভয়াবহ হুমকি দিয়ে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। অনথিভুক্ত অভিবাসীদের পেলে তো পোয়াবারো, কারণ বেআইনি ভাবে সে দেশে গেলে কোনো আইনি পথ তাদের সামনে খোলা থাকে না। পুরুষ নারী সবাইকেই যৌন দাসত্ব করানো যায়।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে বিদেশি শ্রমিকরা শোষিত হয় এবং দাসত্ব করে। সংযুক্ত আরবআমির শাহিতে বসবাসকারী জনসংখ্যার বেশিরভাগই স্থানীয় নাগরিকদের পরিবর্তে বিদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের কাজে লাগায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে স্থানীয়রা ভাবতেই পারে না যে তাদের বাড়ির মেয়ে-পুরুষ পরিচারক-পরিচারিকার কাজ করবে। সেখানে ১৭ লক্ষ বিদেশি কর্মী আছে, নির্মাণ কর্মীদের ৯০ শতাংশই ভারতীয়। প্রাচীন আইনপদ্ধতি অনুসারে 'কাফালা' বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সে দেশের স্পনসরদের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না--- বলপূর্বক শ্রম আদায় ও মানুষ পাচারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা!

ফিফা ২০২২ বিশ্বকাপের জন্য স্টেডিয়াম নির্মাণের সময়ে কাতারে বিদেশিদের, তার মধ্যে বেশিরভাগ ভারত-বাংলাদেশের শ্রমিকদের জোরপূর্বক খাটানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। স্টেডিয়াম নির্মাণের সময় ৬৫০০ জনের বেশি অভিবাসীর মৃত্যুর রেকর্ড করা হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দেখেছে যে প্রতিদিন ৩২০০ জন অভিবাসী শ্রমিক স্টেডিয়ামে কাজ করে। তাদের মধ্যে অবমাননাকর এবং শোষণমূলক আচরণের অভিযোগ করেছে অন্তত ২২৪ জন। শ্রমিকদের কাজ পেতে প্রচুর খরচ করতে হয়, জীবনযাত্রার মান হতদরিদ্র, যে মাইনেতে সই করায় তার চেয়ে অনেক কম দেয়, দেরিতে মাইনে দেয়, স্টেডিয়াম বা ক্যাম্প ছেড়ে যেতে পারে না, দেশ বা চাকরি কিছুই ছাড়তে পারে না। সারাক্ষণ হুমকি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অ্যামনেস্টি বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়ের বিষয়গুলোও ফাঁস করেছে।

সাধারণত পশ্চিম আফ্রিকার কিছু কোরানিক স্কুল জোর করে ভিক্ষাবৃত্তি অনুশীলন করায়। যেহেতু এখন মহামারীজনিত কারণে অনেক ছাত্র স্কুল প্রাঙ্গণে বসবাস করছে, তারা ততটা আয় না করার ফলে আরও দুর্ব্যবহার ও শাস্তির শিকার হচ্ছে।

ইসলামি দেশ মরিটানিয়ার ধনী পরিবারগুলি করোনা মহামারীকেও কাজে লাগিয়েছে, বাড়ির কাজের ভারতীয় লোকদের বরখাস্ত করে বা বাইরে যাওয়া আটকাতে কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ অবস্থায় কাজ করার অনুমতি দিয়ে। এমনভাবে তাদের আটকে রাখে, শত যন্ত্রণা সহ্য করেও তারা বাধ্য হয় কাজ করতো, যেহেতু তারা যদি কাজ না নেয় তবে তারা খেতে পাবে না, আবার তারা কাজ চালিয়ে গেলে পারিশ্রমিক পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। তারা তাদের পরিবারের কাছে টাকা পাঠাতে পারে না।

কাফালা ব্যবস্থা

গাল্ফ বা উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় শ্রমিকদের সব বেসরকারি চাকরি ভিসা স্পনসরশিপ বা কাফালা কাঠামো অনুসারে বহিরাগত শ্রমিকদের 'রেসিডেন্সি লাইসেন্স' পেতে হয়, মানে শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় মালিক বা বস পালটাতে পারে না বা সাধারণত সে দেশ ছেড়ে যেতে পারে না, খাওয়ার জন্য তাদের মালিকের সম্মতি দরকার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এর নিন্দা করেছে বটে তবে অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি। কাফালা ব্যবস্থা ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ বা চলাফেরার স্বাধীনতার সাধারণ মানবাধিকারকে অস্বীকার করে এবং এর ছত্রছায়ায় ভারতীয় বা অন্যান্য অভিবাসীদের কর্তারা অনেক অপকর্ম করে। মালিক, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানিগুলো এই সুযোগে অপকর্ম করার শক্ত খুঁটি পেয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই ব্যবস্থার কারণে তারা মজুরি দেরিতে দেয়, আন্তর্জাতিক পরিচয়পত্র যেমন পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি আটকে রেখে বদলেও দিতে পারে এবং কারণ না দর্শিয়ে শ্রমিকদের তাড়াতে পারে। দেশের শাসকরা, কর্তা ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে আইন ও চুক্তি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনে না বা শুনলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

ভারতীয়রা অনেক সস্তায় তথাকথিত নীচু শ্রেণীর কাজ করে। তাই আরবি মালিকরা তাদের একেবারে উপেক্ষাও করতে পারে না। আর ভারতীয়রা পৃথিবীর বৃহত্তম ঘনবসতিপূর্ণ দেশের নাগরিক হওয়ার কারণে নিজ দেশে

কোনোদিন সম্পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে না।

নারীদের দুর্দশা

যেসব মহিলা গৃহপরিচারিকার কাজ করেন তাঁদের কোনো আইনি সুরক্ষা নেই। তারা অনেক ঝামেলা সহ্য করে, যেমন তাদের বাধ্য করা হয় অতিরিক্ত কাজ করতে কিন্তু তাদের ওভারটাইম দেওয়া হয় না। তাঁদের মানসিক, শারীরিক, মৌখিক এবং যৌন হয়রানি করা হয়। প্রায়ই দেখা যায় ভারতীয় পরিচারিকাদের সঙ্গে আরব দেশগুলিতে খারাপ আচরণ করা হয়, সেখানকার সরকার তাদের আইনি অধিকার সংশোধন করে না। ওই দেশগুলিতে পণ্য চোরাচালানের জন্যও ভারতীয় নারীদের ব্যবহার করা সাধারণ ব্যাপার।

শ্রমিকদের প্রতি অনুচিত আচরণ

আইনি উন্নতির পরেও শ্রমিকরা প্রায়শই দমবন্ধ স্থানে অসহনীয় পরিবেশে কাজ করে, তাদের সত্যি বলতে কোনো কাজ করার মতো ঘর থাকে না। তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনে অংশ নিতে পারে না। ভারতীয় শ্রমিক বা অভিবাসীরা যখন উপসাগরীয় দেশগুলিতে প্রথম কাজ করতে আসে তখন থেকে দুর্ব্যবহার শুরু হয়। তাদের বেশি টার্নওভারের মিথ্যে গল্প বলা হয় এবং রিক্রুটমেন্ট কোম্পানি নির্মম আচরণ করে। কিছু কোম্পানি নিরক্ষর এবং অপ্রশিক্ষিত শ্রমিক বা কর্মীদের মিথ্যা মজুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয় না

অভিবাসী শ্রমিকরা উপসাগরীয় অঞ্চলে যেসব দেশে বসবাস করে তারা অবিরতভাবে আইএলও-এর মৌলিক নীতি এবং কাজের অধিকার সংক্রান্ত অবহেলা করে, বিশেষ করে অধিভুক্তির সুবিধা বা সুযোগ, আরও ভালো মজুরি বা সুবিধার জন্য সামগ্রিক বিনিময়ের বিশেষাধিকার (যেমন ভালো মজুরি ও সুবিধাদির জন্য আবেদন করা) এবং সমস্ত ধরনের পরাধীনতা বা তথাকথিত অবশ্যকরণীয় কাজের নামে বেশি খাটানোর অবসান। সেই দেশগুলো ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের দ্বারা গৃহীত সংগঠন করার স্বাধীনতা ও সমাবেশ আয়োজন করার অধিকারের সুরক্ষা সমর্থন করেনি। সব দিক বিবেচনা করে বলা যায় এইসব যাযাবর শ্রমিকরা সংগঠন করতে বা অবাঞ্ছিত কাজে না করতে পারে না।

শোষণ

দরিদ্র, অক্ষম এবং অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন যাযাবর কর্মীরা প্রায়ই এই দেশগুলেতে যাওয়ার জন্য তাদের সব সঞ্চয় নষ্ট করে। লাভজনক কাজের অন্বেষণে মরিয়া হয়ে, ভারতীয় চাকরিপ্রার্থীর বেসরকারি 'তালিকাভুক্তি এবং কর্মখালি' অফিসে যায়। তাঁরা মনে করে, এটা মেনে নিলেই নিরাপদ আয়ের দরজা খুলে যাবে; কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিতভাবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে শোষণমূলক কারবার করে চলেছে। ভারতীয় অভিবাসীরা বোঝে যে যারা চাকরি দেয় তারা নানাভাবে শ্রমিকদের ঠকায়, ঠকানোটাই তাদের ব্যবসা, যেমন উদাহরণস্বরূপ ভিসা আটকে রাখা, চাকরির নিরাপত্তা, ক্ষতিপূরণ ও শোষণ না করার গ্যারান্টি না দেওয়া।

কোনো পদ্ধতিগত ব্যবস্থা নেই

ভারতে এমন কোনো কার্যকরী কর্তৃপক্ষ নেই যা ভারতের বাইরে চাকরির সুযোগ এবং সেখানে থাকা লোকেদের শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে নজর রাখে। ভারতীয় কর্মী নিয়োগকারী বেসরকারি সংস্থাগুলির উপর নজর রাখতে ভারত সরকার ব্যর্থ হওয়ায় ফলস্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে তারা বিভ্রান্ত করছে বা কোম্পানিগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

অভিবাসনে নিরুৎসাহিত করা

উপসাগরীয় দেশগুলি এখন বুঝতে পারছে যে এই বিদেশি শ্রমিকরা তাদের কাজ নিয়ে নিচ্ছে তাই তারা কিছু নীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা স্থানীয় শ্রমিকদের গুরুত্ব দেয় এবং অভিবাসন বন্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নরূপ :

- সৌদি আরব সরকার ২০১১ সালে নীতি তৈরি করেছিল। নীতিটি ছিল 'নিতাকাত' বা 'শ্রেণীবিন্যাস'— জনসংখ্যাগত চ্যালেঞ্জ এবং নিরাপত্তার মোকাবিলা করার জন্য সৌদিকরণ কর্মসূচির একটি অংশ।
- এই নীতিতে সৌদি আরব সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে সৌদি আরবের নাগরিকদের জন্য ১১ লক্ষ নতুন কাজ সংরক্ষিত করবে।
- নিতাকাত নামক নীতিটি কোম্পানির মোট কর্মীদের মধ্যে সৌদি কর্মীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে হলুদ, সবুজ, নীল এবং লাল রঙে কোম্পানিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে।
- অন্যান্য অনেক উপসাগীয় দেশ ওমানের মতো আইন প্রয়োগ করছে যা ওমানীকরণের নীতি নিয়েছিল তাতে কারখানা থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের সরিয়ে দিয়ে প্রশিক্ষিত ওমান শ্রমিকদের বহাল করে।
- স্থানীয় শ্রমিকদের চাকরি দেওয়ার জন্য কারখানা থেকে অভিবাসীদের সংখ্যা কমিয়ে কুয়েতও একই কাজ করছে।

শ্রম সমস্যা

তাদের একটা বড়ো অংশ উন্নয়নের কাজ করে কিন্তু নোংরা অপরিচ্ছন্ন এলাকায়। তারা সাধারণ বাসস্থানের অভাব, নির্মাণকর্ম স্থলে চরম দুর্দশা, প্রায়শই দুর্ঘটনা, কোনও কাজের নির্দিষ্ট চুক্তি না থাকা এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের কিস্তি প্রত্যাখ্যান ইত্যাদির নানা নির্যাতনের খপ্পরে পড়ে। আরও উল্লেখযোগ্য বৈধ কাজের ভিসা না থাকার কারণে তারা যে সময়েই ধরা পড়ুক না কেন, তাদের পুলিশকে ঘুষ দিতে হয়।

১৮৯তম আইএলও কনভেনশন

রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের আগে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) গঠিত হয়েছিল। 'সকল নারী-পুরুষের জন্য শালীন কাজ' ধ্বনি তুলে শ্রমিকদের অধিকার দান করা বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই চুক্তিটা ২০১১ সালের ১৬ জুন আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের ১০০তম অধিবেশনে কার্যকর হয়েছিল, এটা গৃহ পরিচারক-পরিচারিকাদের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল, তবে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে চালু হয়েছে। কিন্তু আরব দেশগুলোতে এই আইন কার্যত অমিল, অবমূল্যায়িত এবং প্রায়শই মেয়েরা হয়রানির স্বীকার হয়।

উপসাগরীয় দেশগুলিতে, বিপুল সংখ্যক পরিচারক-পরিচারিকা বা গৃহকর্মী 'লিভ-ইন'-এ থাকে বা আছে, এতে বিশ্রামের সময় কমে, কাজের সময় বাড়ে ও যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি বাড়ায়। □

রাজনীতির সেকাল ও একাল

যত দিন যাচ্ছে রাজনীতি ততই কলুষিত হচ্ছে। মানুষ বিশ্বাস হারাচ্ছে। বর্তমানে কামানেবালা রাজনৈতিক মানুষগুলোও চায় মানুষ বিশ্বাস হারাক। মানুষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকুক। তা হলেই তো তাদের ব্যবসা ভালো চলবে। দলে চোর জোচ্চর বেশি হলে কেউই আর কারো সমালোচনা করবে না। ওই দু'একজন কে কী বলল মানুষ তাতে কান দেবে না। আমরা তো সবাই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। মাসির ছেলে যখন, তখন তো ভাইকে দেখা তাদের কর্তব্য। এই হচ্ছে তাদের ভাবনা। পাঠক নিশ্চয় ভাবছেন, 'এ আর নতুন কী? আমরা তো সব জানি। আমরা কি বোকা?' ভাবুন। কোনো ক্ষতি নেই। ভেবে কী লাভ? নিশ্চয় মনে মনে ভাবছেন, 'যেই যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।' তবে বন্ধু কথাটা কিন্তু ভুল। একটু চিন্তা করুন। এই জাতীয় কথা বলে বলে আমরা পরোক্ষ ভাবেই কি অসৎ বা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের সমর্থন করছি না? আসলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে আড়াল বা ছোটো করতেই সমাজে এই ধরনের কথা আমদানি করা হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখুন তো সবাই লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হয়েছেন কি না? স্বয়ং শ্রীরাম লঙ্কায় গিয়ে তো রাবণ হননি। কই এই কথাটা তো কেউ বলে না? এই ধরনের ভাবনাচিন্তার জন্যই তো সমাজে আজ অপরাধীরা ঐকবদ্ধ। কই কখনো কোনো ধর্ষকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সর্বদলীয় প্রতিবাদ সংগঠিত হতে দেখেছেন? ধর্ষক যে দলটি করে আজ সেই দলের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে ধর্ষককে আড়াল করা। নানান গল্প তৈরি করে মানুষের মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

একটু চিন্তা করলে সবটাই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধর্ষক যদি শাসক দলের হয় তাহলে তো কথাই আলাদা। প্রথমত, পুলিশ তাকে ধরবে না। যদি খুব চাপ হয় বা হাতেনাতে ধরা পড়ে তাহলে থানায় জামাই আদর তো তার প্রাপ্য। এর পরে নেতা-মন্ত্রীরা আসরে নেমে নানান নাটক দেখাবেন। তাহলে এরা কেন রাজনীতি করবে না? এমনি করেই রাজনীতি ধীরে ধীরে অপরাধীদের আশ্রয় স্থলে পরিণত হচ্ছে। আর কারা আসছে রাজনীতি করতে? যাদের নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিতে কাজ জোগাড়ের ক্ষমতা নেই তারা। যে শিল্পীদের বাজার নেই, যে উকিলবাবুদের পসার নেই তারা। তবে সবাই তা নয়। বলা ভালো অধিকাংশই। মজার ব্যাপার এরাই দলের বুদ্ধিজীবী হয়ে যায়। দলের সৎ, বিচক্ষণ ও সজ্জনরা ধীরে ধীরে অতল গভীরে তলিয়ে যায়। এরাই হয় দলের মুখ। দলের মাথা। এদের কাছে সমাজ ভালো আর কী পাবে বলুন? ঘরে ঘরে লেখা পড়া শিখে কাজ পাবে না। যদি দাদা ধরতে পারে আর তার সঙ্গে বরাত ভালো থকলে জুটলেও জুটতে পারে সিভিক ভলেন্টিয়ার বা পার্শ্বশিক্ষকের কাজ। তাতে কি পেট ভরবে? তাতে কি মা-বাবার দায়িত্ব নেওয়া যাবে? নিশ্চয় না। তাহলে? পড়ে আছে রাজনীতি। চলে এসো, কামিয়ে নাও। আমায় ভাগ দাও, নিজেও নাও।

এই তো আজ চলছে। নীচু তলার লোকেরা শতকে বা হাজারে চলছে। মাঝারি সাইজের নেতারা খেলছে লাখে আর বড়ো মাপের নেতারা কোটিতে চলছে। তারাই তাদের বেআইনি টাকা দিয়ে শিক্ষিত যুবক যুবতীদের মাসোহারা দিয়ে ক্রমশ সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেকালের রাজনীতি এমন ছিল না। তখন সমাজের বিশিষ্ট জনদের সমাজের লোকেরাই রাজনীতিতে আনতেন। তারা নিজের ইচ্ছায় নির্বাচনে দাঁড়ানোর কথা ভাবতেই পারতেন না। আর আজ? রাজনীতি উলটো পথে চলছে। তাই এতো বঞ্চনা। এতো হাহাকার। উলটো রথের পর সোজা রথ আসে। তাই সমাজের সৎ, শিক্ষিত, মার্জিত ও ভদ্র মানুষের হাত ধরে রাজনৈতিক উলটো রথের অবসান হোক।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারী রোড, হাওড়া-৯।

এখন দিনও রাতের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে

নেড়া বেলতলায় কবার যায়? একবার? না, অনেক বাঙ্গালির বেলতলার অভিজ্ঞতা থাকার পরও আবার বেলতলায় যান। তাঁরা ওপার বাংলা থেকে মার খেয়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে, এক কাপড়ে রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়েছেন প্রাণ বাঁচাতে। এদেশে শরণার্থীদের দলে নাম লেখানোর পরও তাঁরা সেকুলারের গান গেয়ে চলেছেন। আনিস খানের মতো মুসলমান খুনের পক্ষ নিয়ে তাঁরা সেকুলার পন্থী হন, কিন্তু হর্ষের মতো হিন্দু খুনের প্রতিবাদ হলে সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে তারা ভেগে যান। দ্বিচারিতা নাকি তাদের বুদ্ধি বিকাশের চালিকা শক্তি। জেএনইউ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ছাত্ররা আজাদ কাশ্মীর ধ্বনিতে আন্দোলনের প্রগতিশীলতা খুঁজে পান। রাধিকা মেননের মতো নেত্রীরা ছাত্র আন্দোলনের নামে পকেট ভারী করেন উগ্রপন্থীদের হাত ধরে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কখনো দেখতে পান, আবার কখনো দেখতে পান না। আজব চোখ তাদের। যখন খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগে নৃশংসভাবে মৃত্যু হয় তখন ওই বুদ্ধিজীবীরা উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকেন। কখনো তাঁরা চোখে সর্ষে ফুলও দেখেন। উত্তরপ্রদেশ নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে তাদের মাথা কখন খারাপ হয়ে যায়। এ বঙ্গ নরক হলেই বা কী?

বাংলা ভেঙে বঙ্গ হয়। বঙ্গ পুনরায় বাংলা হতে পারে, বিশ্ব বাংলাও হতে পারে কিন্তু সে কখনো ভারতের হতে পারে না, এমন ধারণা বর্তমান শাসকের। এ বঙ্গ যদি কখনো বাংলা হয়? পাকিস্তানের প্রথম আইন মন্ত্রী যোগেন মণ্ডলের মতো মমতা ব্যানার্জির ভৈরবী তাণ্ডবের কী হবে? কখনো যদি ইতিহাসের পুনারাবৃত্তি হয়? ইতিহাসের ছাত্রী হয়ে ইতিহাসের পাতা উলটাতে তাঁর এতো আপত্তি কেন? তৎকালীন বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী

ফঃ ৩

সুরাবর্দির মতো তার নিষ্ঠুর, স্বৈরাচারী, সাম্প্রদায়িক আচরণ জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে। তিনি বোরখা পরা, নামাজ পাঠে বেশ পটু। আল্লাপন্থীদের মতো তিনিও রামবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। সেকুলারপন্থীদের মতো কখনো তিনি রামধনু নয়, রংধনুতে রং খুঁজে বেড়ান। ক্ষমতার জন্যে মানুষ খুন করতে তিনি একটুও কুণ্ঠিত নন। মার্কসবাদীদের লাল বিপ্লবের মতো তাদের স্লোগান— 'খেলা হবে'। দিকে দিকে তাই লাশ নিয়ে খেলা হচ্ছে।

অত্যাচারীর খড়্গ নেমে আসে নির্বিচারে বিরোধীর উপর। সরকার পোষিত সন্ত্রাস আইনি সিলমোহর পায়। গণতন্ত্র কাঁদলে-বা কী? কোভিডের মতো এখন তার ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। হার্মাদ তাড়িয়ে উন্মাদের আগমন কেমন হয় এখন দেখতে পাচ্ছি। তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ জনগণের নাভিশ্বাস। ফড়ে, দালাল, ঠকবাজ, দস্যু, তস্কর, জল্লাদ, খুনে, আসামিদের পাপের দেশ লাসভেগাস বানিয়েছে এ বঙ্গকে। বঙ্গ কখনো লন্ডন হবে না জানি, তবে নিশ্চয় লাসভেগাস হবে। লঙ্কায় হনুমানের আগুন লাগানোর মতো এ বঙ্গে তিনি একাই আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মিথ্যা কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন। নানা কুকর্মে উৎসাহ দিচ্ছেন। রাজ্যপাটের নামে হাজার হাজার কোটি টাকার দেনা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। উন্নয়ন এখন রাস্তায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে চড়াম চড়াম শব্দ করে গুড় বাতাসা খাচ্ছে।

শাসক শ্রেণী এখন জনগণের নেতা নয়, তারা কালীঘাটের নেতা। কালীঘাটে ডাকাতরা কালী মায়ের পুজো দিয়ে দিন দুপুরে ডাকাতি করতে পথে নেমেছে। তারা কালী মায়ের সেবক। তাদের ধরে কে? তাদের ভয়ে পুলিশ, বিচারক এখন এক ঘাটে জল খান। তাদের ভয়ে বুদ্ধিজীবীরা নির্বোধ হন। জনগণের ঘুম পায়। এখন দিনগুলো সব যেন শ্মশানের মতো। ভয় ভয় লাগে। রাতের কথা কী বলব? রাতের রূপ কি দেখা যায়? দুয়ারে সরকারের কল্যাণে এখন রাতগুলো সব যেন লালচে লাগে। চারশো বিশ না বলে ফোর টুয়েন্টি বললে গালাগালি কি একটু বেশি দেওয়া হয়? গণ্ডারের চামড়ার মতো দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের কানে এ গালাগালি কখনো পৌঁছায়? আকণ্ঠ মধুর লোভে এখন মধুলোভীরা ব্যস্ত। এখন দিনও রাতের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

হাঁসখালির নাবালিকা নির্যাতন এবং নাবালিকাটির মৃত্যু প্রসঙ্গে তদন্ত

হাঁসখালির নাবালিকাটির নির্যাতন প্রসঙ্গে তার উক্তি 'মা আমি আর বাঁচবো নি গো...' কতটা মর্মান্তিক হতে পারে এই উক্তি? কীভাবে অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, উৎপীড়িত হতে হয়েছিল নাবালিকাটিকে। এর পরেও মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করছেন 'হাঁসখালিতে পাঁচ দিন পর কেন অভিযোগ' তিনি আরও প্রশ্ন করেছেন 'দেহ দাহ করার পর প্রমাণ হবে কী করে?' প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক তিনি কি ডাক্তার এবং গোয়েন্দা পুলিশের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে চাইছেন? তদন্ত কীভাবে হবে সেটা যারা তদন্ত করবে তাদের ওপর ছেড়ে দিন না? তাঁর কাছে কি সংবাদ পৌঁছয়নি কীভাবে ওই নাবালিকাটির পিতার বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে তাকে ডাক্তার বা হাসপাতালে যাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছিল? তিনি কি জানেন না ওই গ্রামের তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা মৃতার পরিবারকে হুমকি দিয়েছিল অভিযোগ দায়ের করলে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। এরপর কতজন নিরীহ গ্রামবাসীর পক্ষে সম্ভব দাপুটে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধচারণ করে পুলিশ প্রশাসনের কাছে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করার। শুধুমাত্র এই নয়। ওই নাবালিকার মৃতদেহ বাঁশের চাটাইয়ে কোনও রকমভাবে জড়িয়ে নিকটস্থ কোনও শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়, কোনও ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই। অথচ এই বেআইনি কাজ কীভাবে সম্পন্ন হলো সেটাও আশ্চর্যজনক এবং রহস্যজনকও বটে।

এত কিছু ঘটনা ঘটার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করছেন ঘটনা ঘটার পাঁচদিন পর কেন অভিযোগ দায়ের করা হলো। শুধুমাত্র এই নয়। মুখ্যমন্ত্রী জানতে চেয়েছেন, 'দেহ দাহ করার পর প্রমাণ হবে কী করে? তদন্তকারী পুলিশ গোয়েন্দাদের তিনি কি কোনও সংকেত দিতে চাইছেন? মনে রাখতে হবে ২০১২ সালে পার্কস্ট্রিটের সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ যে মিথ্যা বা অসত্য সেটা প্রমাণিত হওয়ার পর তদন্তকারী অফিসার দময়ন্তী সেনকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হলো। ফলে পরবর্তীকালে সেই দক্ষ পুলিশ অফিসার জনমানস থেকে হারিয়ে গেলেন। এইভাবে এক দক্ষ পুলিশ অফিসারকে বরবাদ করে দেওয়া হলো। এরপর আর কতজন সৎ পুলিশ অফিসার নিজেদের মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হবেন? অথচ এই মুখ্যমন্ত্রী তখন ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, দীপালি বসাক নামে এক মূকবধির তরুণীর ওপর নির্যাতনের প্রতিকার দাবি করে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অফিসের সামনে ধরনায় বসেছিলেন। সম্ভবত তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে কলকাতা পুলিশ তাঁর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে লালবাজারে নিয়ে যায়, তারপর রাত ১২টা বা ১টার সময় তাঁকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম!

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার,
চন্দননগর।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

জাংক জুয়েলারি

আধুনিকাদের গয়নার বাক্সে নতুন চমক

স্বাতী চট্টোপাধ্যায়

এমন একটা সময় ছিল যখন বিয়ের সময়ে নতুন বউয়ের দৈহিক ওজন আর তার স্ত্রীধন হিসেবে পাওয়া সোনার গয়নার ওজন দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ করে নেওয়া হতো। আসলে সোনার ওজনের দর চিরকালই মহার্ঘ। শুধু বিয়ে বা সামাজিক অনুষ্ঠান নয়, মন্দিরে দেব- দেবীর পুজোর সময়ে সোনার গয়না বা সোনার তাল দিয়ে অর্ঘ্য দেওয়ার রীতিও রয়েছে আমাদের দেশে। তাই সোনাকে শুধু অমূল্য সম্পদ হিসেবেই নয়, শুভ এবং মঙ্গলের প্রতীক হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

তবে সময় বদলেছে। সেই সঙ্গে বদল এসেছে মানুষে রুচিবোধে। সোনার তুলনা একমাত্র সোনা— এই ধারনাটি মানুষের রক্ত-মাংসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেও সোনা ব্যবহারের রীতি- নীতিতে বেশ কিছু বদল ঘটেছে। ভারী সোনার গয়নার পরিবর্তে এখন হালকা বাহারি গয়না, যার পোশাকি নাম জাংক জুয়েলারি, তা ব্যবহারের রীতি চালু হয়েছে।

সাবেক সোনার গয়নার পরিবর্তে জাংক জুয়েলারি মূলত ফ্যাশনের জন্যই ব্যবহার করা হয়। অলংকারে সেজে ওঠার ক্ষেত্রে আজকের আধুনিকাদের পছন্দের তালিকায় জাংক জুয়েলারি ভারী সোনার গয়নাকে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছে। এখন উৎসব অনুষ্ঠানে ভারী সোনার গয়না যেমন— বাজুবন্ধ, অনন্ত, বাউটি, মানতাসা, রতনচূড় প্রভৃতির বদলে আফগান জুয়েলারি, ট্রাইবাল জুয়েলারি, এমনকী ফলের বীজের তৈরি গয়না পরার রীতি বেশ চোখে পড়ে।

পরিবর্তে জাংক জুয়েলারির জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ার পিছনে কতগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। যেমন পেশায় ফ্যাশন এক্সপার্ট অমৃতা রায়ের মতে মূলত নিত্যনতুন ফ্যাশনের জন্যই আজকের দুনিয়ায় এই জাংক জুয়েলারি ফ্যাশন দুরস্ত মহিলাদের গয়নার

হালফিলে ইন্টারনেট জুড়ে আফগান জুয়েলারি থেকে শুরু করে কাপড়ের বিডস দিয়ে হাতে তৈরি গয়নার সম্ভার ছড়িয়ে রয়েছে। এমনকী মাটির তৈরি গয়নার কদরও বেড়েছে অনেক। আফগান জুয়েলারি বেশ জাঁকজমকপূর্ণ হয়। জমকালো এই জুয়েলারি পরে আজকের আধুনিকারা বেশ ভালোই ফ্যাশন করছেন। মাল্টিলেয়ারড নাগা ট্রাইবাল জুয়েলারিও জাঙ্ক জুয়েলারির মধ্যে পড়ে। বাহারি রংচঙে বিডসের এই নাগা ট্রাইবাল জুয়েলারি হাল ফ্যাশনে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

আরও একটি জাংক জুয়েলারির নাম হলো অক্সিডাইজড জুয়েলারি। রাস্তা- ঘাটে এখন হামেশাই এই গয়নার ব্যবহার খুব চোখে পড়ে। শুধু অল্প বয়সিরাই নয়, বয়স্করাও এখন এই গয়না ব্যবহারে বেশ সিদ্ধহস্ত। শাড়ি থেকে শুরু করে ওয়েস্টার্ন যেকোনো পোশাকের সঙ্গে এই গয়নাটি নিজেকে বেশ মানানসই করে তুলেছে। অক্সিডাইজড কানের দুল, হাতের বালা বা গলার হার ছোট থেকে বড় সবারই গয়নার বাক্সে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

রুপো- দস্তার জুয়েলারিও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। সাজগোজের মধ্যে একটা ট্রাইবাল ছোঁয়া আনতে এই গয়নার ব্যবহার অন্যতম। আবার ফলের বীজের গয়নাও আজকের আধুনিকাদের মন জয় করে নিয়েছে। শান্তিনিকেতনের খোয়াইয়ের হাটে এই বীজের গয়না কেনার হিড়িক দেখলেই তা বোঝা যায়। শিম- বরবটি- তরমুজ- নাগকেশরের বীজ বা নাগকেশরের ফল শুকিয়ে সেগুলো গেঁথে তৈরি হয় গলার হার, দুল প্রভৃতি। আসলে এই গরমকালে হালকা সাজের উপকরণ হিসেবে এই গয়না বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

আধুনিকাদের স্টাইল স্টেটমেন্টে এখন খাঁটি ও বহু মূল্যবান সোনার গয়নার বাক্সে একটা স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। আবার সফটওয়্যার প্রোফেশনাল পারমিতা পাল মনে করেন এখনকার দিনে ভারী সোনা পরে রাস্তা- ঘাটে চলাফেরা করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া গয়নার বদলে হালকা ও রকমারি জাংক জুয়েলারি সহজেই সামলানো যায়। অন্যদিকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কর্মী অর্পিতা দত্ত আবার বিশ্বাস করেন যে সোনার গয়নার কোনো বিকল্প নেই। তবে দৈনন্দিন ব্যস্ততার জীবনে জাংক জুয়েলারি একদম পারফেক্ট। অফিসের পার্টি হোক বা সামাজিক অনুষ্ঠান- জাংক জুয়েলারিই এখন সুপারহিট। তবে গৃহবধূ অরুণিমা মজুমদার একটু অন্যভাবে ভাবেন। সোনার গয়না যখন তখন যেখানে সেখানে পরে যাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সস্তা অক্সিডাইজড গয়না বা আফগান জুয়েলারি সহজেই পরা যায়।

নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক কারণ যা-ই হোক না কেন, অমূল্য সম্পদ সোনার বাজারে ইদানীং জাংক জুয়েলারির চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে সোনার বিপণি সংস্থাগুলোও নিজেদের নতুনভাবে মানিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আর সেই কারণেই দোকানের শোকেসগুলিতে এখন সাবেক সোনার গয়নার পাশে জাংক জুয়েলারির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখা যাচ্ছে। ▯

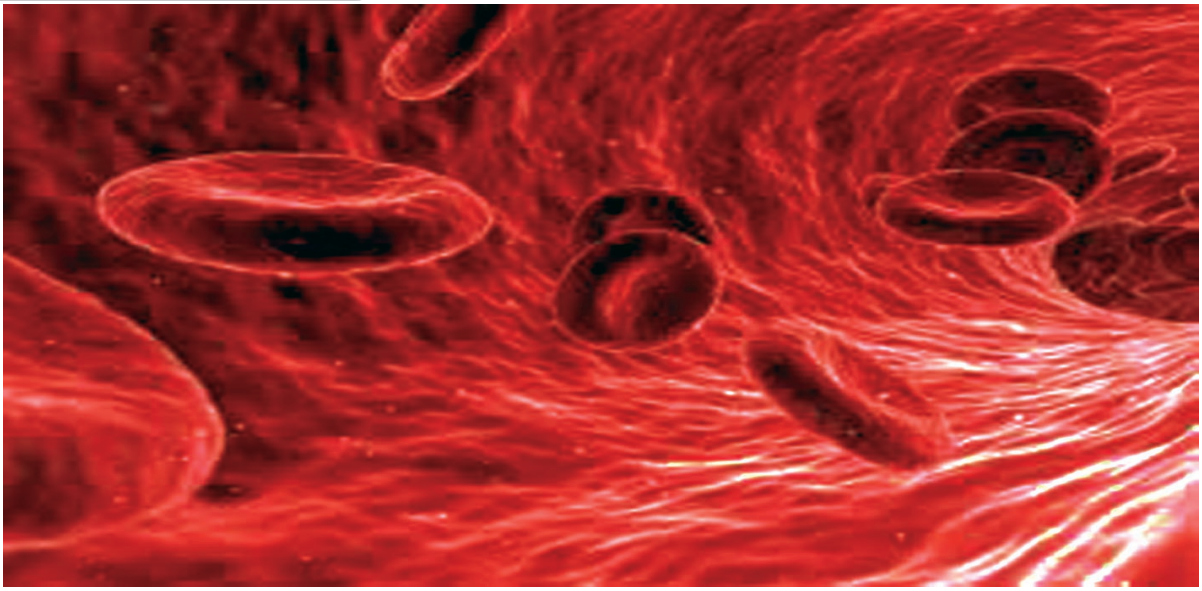

রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বেশি হলে হতে পারে পলিসাইথিমিয়া

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

স্বাভাবিকভাবে একটি পুরুষের ১৮.৫ আর নারীদের ১৬.৫। এর বেশি হিমোগ্লোবিন হয়ে গেলে তা 'পলিসাইথিমিয়া' নামের রোগের প্রধান লক্ষণ। হিমোগ্লোবিন বেড়ে গেলে রক্ত ঘন হয়। ছোটো ছোটো রক্তের ডেলা তৈরি হওয়ার সুযোগ বাড়ে। ভালো করে চিকিৎসা না হলে সেই সব ডেলা হার্ট অ্যাটাক, পালমোনারি এমবলিজম, স্ট্রোক বা পায়ে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিসের মতো অসুখের আশঙ্কা থাকে। পলিসাইথিমিয়া দু'রকম। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি। প্রাইমারি রোগ হয় অস্থিমজ্জা বা বোনম্যারোতে রক্ত তৈরি হওয়ার পদ্ধতিতে কিছু গোলমাল হলে। তবে এটি খুবই বিরল। লাখখানেক মানুষের মধ্যে একজনের হয়। কিছু পরিবারে একাধিক জনের এই সমস্যা থাকলেও রোগটি বংশগত নয়। সেকেন্ডারি পলিসাইথিমিয়া তুলনায় বেশি হয়। এর মূলে নানা কারণ। যেমন পাহাড়ি এলাকায় বাতাসে অক্সিজেন কম থাকে বলে শরীর বেশি হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। কারণ এর মাধ্যমে বেশি অক্সিজেন ধরে সে শরীরের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে। এতে এই রোগের সূত্রপাত হয়। সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ। ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ আপনিয়া ইত্যাদি অসুখে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর ধূমপান করলে বা খুব বেশি পরিমাণে দূষণের মধ্যে কাজ করলে এই অসুখ আক্রমণ করে। গ্যারেজে, মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ করলে এই রোগের আশঙ্কা থাকে।

কী দেখে বুঝবেন : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষা না করলে কিছু বোঝা যায় না। গাল বা মুখ, হাত, পায়ের তলা একটু লালচে হতে পারে। কালশিটে পড়তে পারে। মাথাব্যথা, চুলকানি, ক্লান্তি, মাথাঘোরা, পেটে ব্যথা থাকে অনেকের। নাক, পাকস্থলি বা অন্ত্রে রক্তপাত হয় কিছু ক্ষেত্রে। ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গাউট হতে পারে। সঙ্গে কোমর-পাঁজরে লাগাতার ব্যথা হয়। রক্তচাপ বাড়ে কারও। রোগ থাকতে থাকতে প্লীহা ও লিভার বড়ো হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা : রুটিন রক্ত পরীক্ষায় হিমোগ্লোবিন বেশি পাওয়া গেলে রোগীকে পরীক্ষা করে দেখা হয়। তাঁর এবং তাঁর পরিবারে কী সমস্যা আছে, তিনি কী কাজ করেন ইত্যাদি জানার পরে আরও কিছু পরীক্ষা করা হয়। কিছু না পাওয়া গেলে বোনম্যারো পরীক্ষা করতে হয়। প্রাইমারি রোগে তেমন জটিলতা না থাকলে চিকিৎসা ছাড়াই রোগী ভালো থাকেন। সেকেন্ডারি পলিসাইথিমিয়ায় রোগের কারণ দূর হলে সমস্যা কমে যায় সচরাচর। জলশূন্যতা যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। আয়রন সাপ্লিমেন্ট খাওয়া ও ধূমপান করা নিষেধ থাকে। কাজকর্ম-খেলাধুলায় তেমন কোনও বারণ নেই। তবে পিলে বড়ো হয়ে গেলে পেটে ধাক্কা লাগে এমন খেলা না খেলাই ভালো। প্রাইমারি পলিসাইথিমিয়ার মূল চিকিৎসা মাঝেমধ্যে এক-আধ বোতল করে রক্ত বের করে নেওয়া। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রথম দিকে ২-৩ দিন বাদে বাদে করতে হয়। এই পদ্ধতির নাম ফ্ল্যাবোটমি। রক্ত ডেলা বাঁধার আশঙ্কা থাকলে ওরাল কেমোথেরাপির ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় অনেক সময়। ষাটোর্ধ্ব মানুষ যাদের ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগ আছে, রক্তে প্লেটলেট বেড়ে গিয়েছে এমন হলে এই ওষুধে বেশ ভালো কাজ হয়। ফ্ল্যাবোটমির ধকল সামলাতে না পারলেও এই ওষুধ দেওয়া হয়। রক্ত ডেলা বাধার প্রবণতা কমাতে অ্যাসপিরিন দেওয়া হয় কিছু ক্ষেত্রে। ফ্ল্যাবোটমির সঙ্গে এই ওষুধ খেলে ফলাফল খুব ভালো হয়। তবে রক্তপাতের ইতিহাস থাকলে এই ওষুধ দেওয়া যায় না। নিয়মিত ফলো আপ করে যেতে হয়। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস এবং পালমোনারি এমবলিজমের প্রবণতা থাকলে, নাক বা পাকস্থলিতে রক্ত ক্ষরণের আশঙ্কা থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা দরকার। তবে এই ধরনের বিপদ একটু কমই হয়। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আমরা সাফল্য পেয়েছি। □

একুশের নির্বাচন, তৃণমূলের সন্ত্রাসের ‘খেলা’

জগন্নাথ চ্যাটার্জী

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর এক বছর হতে চললো। তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের একমাত্র বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। গণতন্ত্রের প্রাথমিক পাঠ অনুযায়ী এবার শাসক-বিরোধী দলের সমন্বয়ের মাধ্যমেই রাজ্যের আগামী পাঁচ বছরের শাসন চালানোর কথা মমতা ব্যানার্জির। বিরোধী দলের বিরোধিতা করার অধিকারও সংবিধানের মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বহমান রাখার অন্যতম শর্তও বটে। যা হওয়া মানেই তো সোনার বাঙ্গলার পথে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু বর্তমান শাসকের হাতে ‘খেলা হবে’র প্রচ্ছন্ন হুংকারে কম্পমান পশ্চিমবঙ্গ। তাই সংবিধান, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সর্বোপরি সুশাসন এখানে খেলার ছলেই লুপ্তপ্রায়।

মমতা ব্যানার্জির রাজত্বে শাসকের বিরোধিতা মানেই সন্ত্রাসের শিকার হওয়া। গত বছর ২ মে ফল ঘোষণার বিকেল থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের মদতে যে সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল তা এখনও থামার নাম নেই। বরং প্রতিদিনই শুধুমাত্র বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অপরাধে তালিবানি কায়দায়, তালিবান দ্বারা অনুপ্রাণিত শাসকের প্রাণভোমরার দল গ্রামে গ্রামে আক্রমণ চালাচ্ছে। কোথাও প্রাণে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া, কোথাও বুলডোজার দিয়ে বাড়ি, দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া, কোথাও গণধর্ষণ, কোথাও গ্রামের পর গ্রাম মানুষকে ঘরছাড়া করে দেওয়ার ঘটনা যেন থামতেই চাইছে না। আর্ত মানুষের কান্না যদিও নবান্নের চোদ্দতলায় পৌঁছায় না। পুলিশ-পেয়াদাদের রিপোর্টে এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কোনও প্রতিফলন নেই। আর রাজ্যের সংবাদমাধ্যম ‘সন্ত্রাস’ শব্দটি ইতিপূর্বে

ফাইল চিত্র

কোনওদিন শুনেছে বলেও মনে হচ্ছে না। যদিও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা জানেন, রাজনৈতিক হিংসার বলি ও ঘটনার সংখ্যার নিরিখে গত পাঁচ দশকে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগণ্য। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোর বিকাশ হোক বা না হোক, সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতায় কংগ্রেস, বাম কিংবা তৃণমূলের মধ্যে কোনও ফারাক নেই।

তবে ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পর যে সন্ত্রাসের সামনে বিজেপি কর্মীদের পড়তে হয়েছে তা অভাবনীয়। গ্রাম বাঙ্গলার অনেক প্রবীণ মানুষের কথায়, নকশাল আমলেও এবারের মতো সরকারি মদতে, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে সমাজের একাংশ অপর বৃহৎ অংশের প্রতি পরিকল্পনামাফিক সন্ত্রাস চালায়নি। তৃণমূলের ভোট জেতার আনন্দে তিন-চারটি ছাড়া বাকি সমস্ত জেলায় যে ভাবে লুঙ্গিবাহিনী তুলসীমঞ্চ থাকা বাড়িগুলিতে বেছে বেছে, লুঠ, ধর্ষণ এবং প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে তা ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশনের দিনগুলির কথা মনে পড়াতে বাধ্য।

এ রাজ্যের রাজনৈতিক হিংসার অতীত আর বর্তমানের পরিসংখ্যানগত আলোচনা করলেই বোঝা যাবে তৃতীয় তৃণমূল সরকারে আর যাই থাক ‘মমতা’ বলে কিছু নেই। যা আছে তা শুধুই নির্মমতা। ফলে সেই আমলে জমিদার-জোতদারদের নিয়ন্ত্রণে থাকা কংগ্রেসিদের হাতে সমাজের নীচুতলার মানুষের বহু ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসের দলিলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কংগ্রেসি সরকারের পতন ও বাম জমানার সন্ধিক্ষণে এক দশকের বেশি নকশালি সন্ত্রাস ও খুনের রাজনীতি দেখেছে এই রাজ্য। সেই ধারা বজায় থেকেছে বাম জমানাতেও। প্রমোদ দাশগুপ্তের বঙ্গীয় মার্কসবাদ আসলে ছিল গরিব মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রশ্নে নিরাপত্তার কৃত্রিম সংকট বজায় রাখা এবং সমাজের সর্বস্তরে ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত ভয়ের পরিবেশ জিইয়ে রাখা। সিপিএমের সাড়ে তিন দশকের ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করার প্রক্রিয়া ক্রমশই রাজ্য রাজনীতির মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। ৩৪ বছরের বাম শাসনে এলাকাভিত্তিক বিরোধী দলনেতাদের নিকেশ করার পরিকল্পনা থেকেই বোধ হয় রাজ্য রাজনীতিতে রাজনৈতিক খুনোখুনি অবিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে গিয়েছে।

বাম জমানাতেও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীদের প্রার্থী হতে না দেওয়া, মারধর, বিরোধী দলের নেতাদের বাড়িতে সাদা থান পাঠিয়ে দেওয়া, ভোটের আগে বিরোধী

ভোটারদের ঘরছাড়া করে দেওয়া একপ্রকার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সময়ের কী পরিহাস, যে কৌশলে বামেরা এক সময় বিরোধী শূন্য রাজনীতির শুভারম্ভ করেছিল, সেই প্রক্রিয়াতেই তৃণমূল গত ১০ বছরে বামেদের খতম করে দিয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে রাজনৈতিক হিংসার ধ্বজাধারী এই দলের কোনও প্রতিনিধিই নেই। বিধানসভায় একদিকে অতীব অত্যাচারী তৃণমূল কংগ্রেস, অন্যদিকে বাঙ্গলার রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদ-দীনদয়ালের আদর্শে চলা বিজেপি দাঁড়িয়ে। মিথ্যাচারী তৃণমূলের সঙ্গে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, বাঙ্গলার গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে শামিল বিজেপির সংগ্রাম চলছে। বাঙ্গলা থেকে তৃণমূলের বিদায় একদিন হবেই। ১৫০-এর বেশি বলিদানির তর্পণ বৃথা হতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে হিংসার বহর বোঝাতে কিছু পরিসংখ্যান না দিলেই নয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হিসাবে, ২০১৯-এর লোকসভা ভোট পর্বে ৬৯৩টি রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। মারা গিয়েছে ১১ জন। ভোট মিটে যাওয়ার পরেও কিন্তু হিংসা থামেনি। ভুলে গেলে চলবে না, ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি ১৮টি আসন জিতেছে। তার পরেও ২০১৯-এর ১ জুন থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৫২টি রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে পেরেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তাতে মারা গিয়েছেন ৬১ জন। যাঁদের অধিকাংশই বিজেপির কর্মী। ২০২০ সালেও ৬৬৩টি রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দাবি। তাতে মারা গিয়েছেন ৫৯ জন রাজনৈতিক কর্মী।

অধিকাংশ অবশ্যই বিজেপি কর্মী। ২০১৮-এর পঞ্চায়েত ভোটেই খুন হতে হয়েছে ২৩ জন রাজনৈতিক কর্মীকে। অন্তত ২০০টি স্থানে রাজনৈতিক হিংসা হয়েছিল। রাজ্য অবশ্য দাবি করেছিল, এসব কিছুই হয়নি।

এখানেই শেষ নয়, জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে সারা দেশে ১৬ জন রাজনৈতিক কর্মী মারা গিয়েছে। তার মধ্যে ৭ জন ছিল পশ্চিমবঙ্গের। ২০১৪ সালের ভোটে ২০০৮ জন ভোটকেন্দ্রিক সংঘর্ষে আহত হয়েছেন। তার মধ্যে ৬৪ শতাংশ অর্থাৎ ১২৯৮ জন এই রাজ্যের। ১৯৯৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ১৮ বছরে গড়ে পশ্চিমবঙ্গে ২০টি রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে বলে এনসিআরবি'র কাছে নথি রয়েছে। দেশের অন্যত্র রাজনৈতিক খুনোখুনির এমন নজির নেই। বাম জমানায় ২০০৯ সালে সর্বোচ্চ ৫০টির বেশি রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে বলে সে সময়কার বাম সরকারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে রিপোর্ট পাঠিয়ে জানিয়েছিল। যদিও ২০১৮-এর পঞ্চায়েত হিংসা, হানাহানির পর রাজ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে আর রাজ্যের অপরাধের পরিসংখ্যান পাঠায় না। ফলে সারা দেশের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত অপরাধের গুণগত বা তুলনামূলক আলোচনা করার সুযোগ নেই। দেশের মধ্যে সেরা প্রমাণ করার জন্য নবান্ন নির্দেশিত নথি সরকার মাঝে মাঝে প্রকাশ করে আর দাবি করে থাকে, 'সবেতেই এগিয়ে বাংলা।'

বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়েও এই তত্ত্বের অন্যথা হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলায় রাজ্য সরকার প্রথমে ভোটের পর কোনও হিংসা হয়েছে তা মানতেই চায়নি। পরে অভিযোগকারীরা প্রমাণ-সহ নথি আদালতে জমা দিলে রাজ্য সরকার বলে 'কোথাও কিছু ঘটে থাকলে তা রাজনৈতিক হিংসা নয়। ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষকে বিরোধীরা রাজনৈতিক সন্ত্রাস হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে।'

ভোট পরবর্তী হিংসার তথ্য সংগ্রহে বিজেপি বিশেষ জোর দিয়েছিল। প্রতিটি পদক্ষেপে আক্রান্তদের পুলিশের জুলুমবাজি ও শাসানির মুখে পড়তে হয়েছে। তার পরেও বিজেপির নিজস্ব নথি অনুসারে, যত সংখ্যক স্থানে ঘটনা ঘটেছে তার মাত্র অর্ধেক অভিযোগ আকারে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশের শাসানি এবং অভিযোগ গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় কয়েক হাজার আক্রান্ত পরিবার নীরবে সব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তার পরেও সাড়ে ৬ হাজার মানুষ রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বিভিন্ন কমিশনে অভিযোগ জানিয়ে খুন, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ, বাড়িঘর ভাঙার অভিযোগ জানিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সামনেও দেড় হাজার আক্রান্ত নিজেদের বয়ান লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। শুধু মাত্র তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার অপরাধে যে শাস্তি এই মানুষদের পেতে হয়েছে তার বিচার পেতে বিজেপিও দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছে। আইনের রাস্তাতেই বেআইনি সরকারের বেআব্রু দশা প্রকাশ করার জন্য বিজেপির আইনি লড়াই আরও জোরদার করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও অভয় দিয়েছেন।

কেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাসে ২০২১-এর নির্বাচন কালো অধ্যায় তা নীচের তথ্য থেকে স্পষ্ট হবে।

গত বছর ২ মে বিকেল থেকেই সারা রাজ্য থেকে হাজার হাজার কার্যকর্তার ফোন বিভিন্ন পার্টি অফিসে আসা শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা বুঝতে পারছিলেন, পরিকল্পনা করে নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু হয়েছে।

তৃণমূলের ছত্রছায়ায় লুঙ্গি বাহিনীরা গ্রামের পর গ্রাম, শহরে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় কার্যত হানাদারদের মতো তারা যেতে শুরু করেছিল। সম্ভবত, এই রাজ্যের বুকে এই প্রথম জেসিবি মেশিন দিয়ে তৃণমূলের হার্মাদরা বিজেপি কর্মীদের দোকান-বাড়ি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। বিজেপির হিসেব অনুযায়ী, অন্তত ৮০ হাজার দলীয় কর্মী ২ মে রাতে বাড়িতে থাকতে পারেননি। তাঁরা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অনেকে অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার মতো প্রতিবেশী রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। দলীয় কর্মীদের আশ্রয় দিতে ১৯১টি শিবির খুলতে হয়েছিল বিজেপিকে। সেখানে মাসাধিককাল প্রায় ১০ হাজার কার্যকর্তা আশ্রয় নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে তাঁরা বাড়ি ফিরে যেতে শুরু করেছেন। এখনও কয়েকশো কার্যকর্তা বাড়ি ফিরতে পারেননি। হয়তো স্থায়ীভাবেই তাঁদের অন্য কোথাও থেকে যেতে হবে। দলীয় রিপোর্ট অনুসারে, গত বছর ২ মে থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ১১ হাজার ৭৮২টি স্থানে ভোট সংক্রান্ত হিংসা ও হামলা হয়েছে। খুন হয়েছেন ৪৫ জন দলীয় কর্মী। ৩টি গণধর্ষণের ঘটনায় সাহস করে অত্যাচারিতা অভিযোগ দায়ের করেছেন। ১২৩ জন মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানোর ঘটনা ঘটেছে। দলের কাছে ওই মহিলা কার্যকর্তা বা কোনও কার্যকর্তার পরিবারের মহিলা সদস্যা তৃণমূলি হার্মাদদের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তপশিলি জাতির ৩৬৪৯ জন কার্যকর্তা এবং ৮৭৩ জন তপশিলি জনজাতি কার্যকর্তার উপর হামলা হয়েছে। ওবিসি সম্প্রদায়ের ১০৭৭ জন মানুষের উপর হামলা

হয়েছে।

দলীয় নথি অনুসারে, ১১ হাজার ৭৮টি হামলার মধ্যে ৩৮৮৭টি হামলার ঘটনা সরাসরি দলীয় কার্যকর্তাকে খুন, মারধর ইত্যাদি করা হয়েছে। ৮৩০টি ক্ষেত্রে খুনের চেষ্টা হলেও কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচেছেন কার্যকর্তারা। ৬৪৪৭টি ক্ষেত্রে দলীয় কার্যকর্তাদের না পেয়ে তাঁদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ৩৯ জন মহিলার উপর অত্যাচার কার্যত অবর্ণনীয়। কোনও একটি নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর ১১ হাজার ৭৮২টি স্থানে হামলার ঘটনা গণতন্ত্রের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের দিকটিই তুলে ধরে।

দলীয় নেতৃত্বের দাবি, প্রায় ১২ হাজার স্থানে ঘটনা ঘটলেও পৃথক পৃথক হামলার কথা ধরলে তা ২৫ হাজারের বেশি। কারণ, কোনও একটি নির্দিষ্ট গ্রামে তৃণমূলি লুঙ্গিবাহিনী হানা দেওয়ার পর সেটি একটি ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে ওই গ্রামে আক্রান্তদের পৃথক তথ্য ধরে আসলে হামলার ঘটনার সংখ্যা লিপিবদ্ধ ঘটনার দ্বিগুণ হবে। পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ কতটা ক্ষয়িষ্ণু এবং পুলিশ-প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা যে আর নেই তার প্রমাণ নিজের সর্বস্ব খুইয়েও বহু নির্যাতিত অত্যাচারিত মানুষ প্রাথমিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতেই রাজি হচ্ছিলেন না। বিজেপির তৃণমূলস্তরের কার্যকর্তাদের ধারণা হয়েছে, যে রাজ্য সরকারের পুলিশের মদতে লুঙ্গিবাহিনী টানা হামলা চালাচ্ছে, সেখানে অভিযোগ জানিয়ে কী লাভ? দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ায় মানুষকে বিচারের ব্যবস্থা করতে অভিযোগ যে জানাতে হবেই, বুথস্তর পর্যন্ত কার্যকর্তাদের কাছে এই বার্তা যাওয়ার পর শুরু হয় অভিযোগ দায়ের। যথারীতি অধিকাংশ স্থানেই পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলায় সে কথা উল্লেখ করার পর আদালত ই-মেলে বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে নির্দেশ দেয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় তপশিলি জাতি ও জনজাতি কমিশন, মহিলা কমিশনের অভয়দানে কয়েক হাজার অভিযোগ দায়ের করার সাহস দেখান আক্রান্তরা। জুনের শেষ পর্যন্ত ৬ হাজার অভিযোগ বিভিন্নস্তরে আক্রান্তরা জানিয়েছেন। মানবাধিকার কমিশনও জেলায় জেলায় ঘুরে আক্রান্তদের সত্যতা দায়ের করা অভিযোগের যাচাই করেছেন। বহু ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের তদন্তে যে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দল সেইসব স্থানে গিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে মানবাধিকার কমিশনের রির্পোটও জমা পড়েছে।

ফাইল চিত্র

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল জগদীশ ধনকড় জেলায় জেলায় অকুস্থল পরিদর্শন করেছেন। নির্যাতিত মানুষ তাঁকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। রাজ্যপাল শুনেছেন সেই সব বিভীষিকার কাহিনি। তাঁর রিপোর্টও গেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে। পরিশেষে ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে পুলিশকে নির্দেশ দিক হাইকোর্ট, এই মর্মে উচ্চ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতির কাছে আবেদন করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালা। ঘরছাড়াদের বাড়ি ফেরাতে মানবাধিকার কমিশনকে মাঠে নামার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে রাজ্যকে নির্দিষ্ট নীতি তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। ▯

হিংস্রতার আরেক নাম তৃণমূল কংগ্রেস

সুমন চন্দ্র দাস

২ মে ২০২১ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে যে সন্ত্রাস চলে তা হলো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে রাজনৈতিক সন্ত্রাস। অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে ধর্মীয় সন্ত্রাস। একমাত্র পছন্দের প্রার্থীদের নিজে নির্বাচন করে, নিজের ভোট নিজে দেওয়ার জন্য সন্ত্রাস সংগঠিত হয়। এই সন্ত্রাসের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে পরবর্তী পৌরসভা- কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত এবং লোকসভার ভোটকে বিরোধী শূন্য করে একনায়কতন্ত্রী জেহাদি শাসন প্রতিষ্ঠার বিশেষ ভাবনা খুব স্পষ্ট ভাবে নিয়েছিল নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার। হিংসার ঘটনা নিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব ঘটনা ফেক নিউজ'। খুব স্পষ্ট করে হিংসার ঘটনাকে বলেন, 'চোখে নেবা হলে আমি কী করবো, সবটাই গিমিক'। অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক এই মন্তব্য। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা, কুলতলী, পাথর প্রতিমা, হিঙ্গলগঞ্জ, বাদুরিয়া, স্বরূপনগর, রাজারহাট গোপালপুর নয়াপট্টি, নজরুল পল্লী, উদয়ন পল্লী, সুকান্ত নগর, দত্তাবাদ, কেষ্টপুর, সিদ্ধার্থ নগরে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় সন্ত্রাস হয়। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া। সন্দেশখালি হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার পারঘুমটি রূপমারি মাধবকাঠি খুলনাহাটাতে দোকানপাট ভাঙচুর চালায়, বোমাবাজি চালায় দুষ্কৃতীরা। সন্দেশখালি বিধানসভার ছোটো শেয়েরা, বসিরহাট মহকুমার শাসকের বাড়ির কাছে হিন্দুদের ঘর দোকান লুটপাট হয়েছে। বসিরহাটে প্রায় পাঁচশো মানুষের বাড়িঘরে লুটপাট চালায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। নিমাই চৌকিদারের বাড়িতে ভাঙচুর লুটপাট চালায় জেহাদি তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। বামনপুকুর, মালঞ্চ, কালীনগর বাজারে প্রায় ৩০টির মতো দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেয় জেহাদি তৃণমূলের গুন্ডারা। হাড়োয়ার উচিলদহের গ্রাম মিনাখাঁয় বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার হয়। দেগঙ্গা গোসাবা, সাতজেলিয়া, শম্বুনগর পঞ্চায়েতে বিপ্রদাসপুরে তৃণমূলের দ্বারা ব্যাপক লুটপাট ভাঙচুর হয়। কালসুর, চাকলা, বেড়াচাপা, হাদিপুর, ঝিকরা সর্বত্র হিংসা চালায়। চাকলা নুরনগরে রেশন কার্ড ও রেশনের আটা চাল লুট করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। এছাড়া নুরনগর পঞ্চায়েতর গোবিন্দপুর বটতলায় রেশন দোকানে সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্র সরকারের দেওয়া রেশন লুট করে। কোচবিহার, ব্যারাকপুর, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মালদহ, বালুরঘাট, বর্ধমান শহর, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ হাওড়ার জিটি রোডে গণনা কেন্দ্র দখল করে। হাওড়ার ১, ৩, ৭, ১১, ৩১, ৩৩, ৪৬, ৫৭, ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডে দোকান লুটপাট হয়।

ফলাফল প্রকাশের দিন কাঁকুড়গাছি রেল কেবিনের পাশে শীতলা তলায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা নির্মমভাবে পিটিয়ে খুন করে অভিজিৎ সরকারকে।

তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও-ব্রায়ান বলেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে। গুলি করে হারান রায়কে হত্যা করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। হাসানুজ্জামান নামের আইএসএফ কর্মীকে কুপিয়ে খুন করে। সোনারপুরে প্রতাপনগরে হারান অধিকারী নামে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজি করে হত্যা করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। পূর্ব বর্ধমানের রায়নাতে গণেশ মালিক, জামালপুরের নবগ্রামের বিজেপি কর্মী আশিস ক্ষেত্রপালের মা কাকলি ক্ষেত্রপালকে খুন করা হয়। খানাকুলের নতিবপুর-২ অঞ্চলে দেবু প্রমাণিত, নদিয়ার গাংনাপুরে বিবেকানন্দ পালিত, উত্তর ঘোষ রাজনৈতিক খুন হয়েছেন। ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই নন্দীগ্রাম, নয়নান, শেখানচক, বয়ালে বিরোধী বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা লুটপাট চালায়।

৭ মে ২০২১, টিভি-৯ ভারতবর্ষ চ্যানেলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'আমরা নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারকে বলতে চাই, রাজ্যজুড়ে চলা হিংসার পরিস্থিতি অতিসত্বর স্বাভাবিক করুন। এবং রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করুন দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি দিন। মমতা ব্যানার্জি সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিক।'

১০ মে ২০২১, টাইমস্ নাউ ডিজিটালে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, রাজ্যপাল বলেন, টিএমসি সরকার হিংসা নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সাংবিধানিক দায়িত্বের জায়গা থেকে আমি চুপ থাকতে পারি না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে হিংসা কবলিত এলাকায় পরিদর্শন করব। যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে তাদের চিহ্নিত করা আবশ্যক। ডিজিপি, সিপি-র কাছে তিনি রিপোর্ট চেয়েছেন। রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে রিপোর্ট চেয়ে হিংসায় কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন তা জানতে চেয়েছেন।

মে ১৪, ২০২১, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস সংবাদমাধ্যমে ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউল কাস্ট চেয়ারম্যান বিজয় সম্পালা দুই দিনের জন্য ভোট-পরবর্তী হিংসার ক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। এই হিংসা পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি সমাজের মানুষের ওপর 'নৃশংস' আক্রমণ। বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে জিনিসপত্র এলোমেলো এবং লুট করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের নবগ্রাম থানায় গ্রামের ঘটনায় আক্রান্তরা বিবরণ দিয়েছেন।

২৪ মে ২০২১, OUTLOOK THE NEWS SCROLL-র সংবাদে পাওয়া যায় ২০৯৩ জন মহিলা আইনজীবী সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখে রাজ্যের সাংবিধানিক সংকটের কথা বলেন। সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা শোচনীয় বলে মনে করেন। কোর্টের পর্যবেক্ষণে এসআইটি গঠন করার কথা বলা হয়।

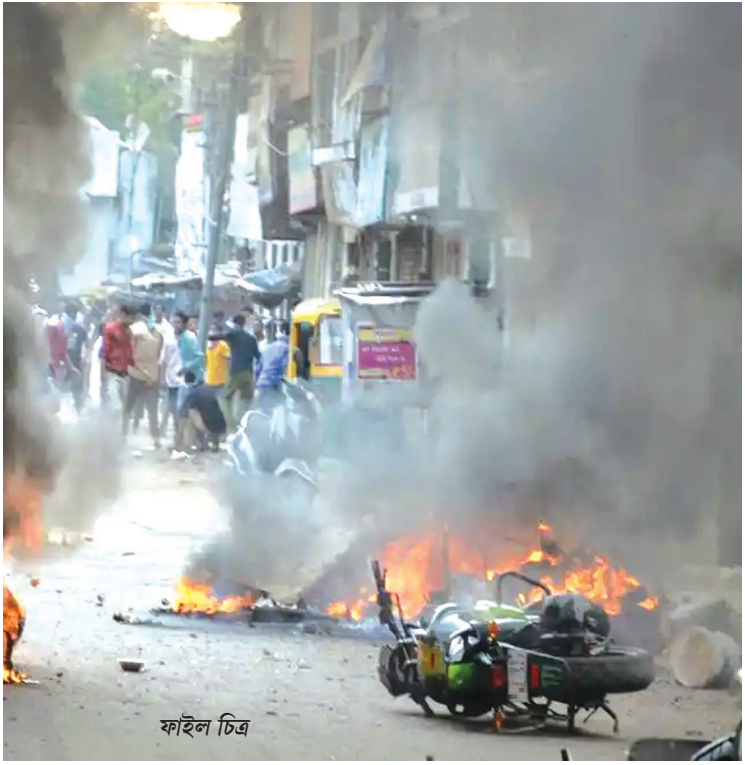

ফাইল চিত্র

২৪ মে ২০২১, টিভি-৯ ভারতবর্ষ চ্যানেলে পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসার কথা বলতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়ে এসআইটি গঠন বা এনআইএ দ্বারা তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান। সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের তত্ত্বাবধানে তদন্ত করার আবেদন করেন। ১৮৬ জন প্রাক্তন বিচারপতির সই যুক্ত বিশেষ পত্র পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতির কাছে।

২৮ মে, ২০২১, নিউজ ১৮.কম মিডিয়াতে খবর হয় ৪ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্য পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষেন রেড্ডিকে প্রতিবেদন দেন এবং এই ভোট পরবর্তী হিংসার কারণ খোঁজার বিষয়ে বিশেষভাবে তথ্য দেন।

২ জুন, ২০২১ দি হিন্দু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয় গুয়াহাটি হাইকোর্ট বলে যে ৪০০ নিপীড়িত মানুষ ভোটের হিংসার শিকার হয়ে কোচবিহার থেকে চলে গিয়ে অসমের ধুবরিতে আশ্রয় নেন। এই বিষয়ে গুয়াহাটি হাইকোর্টে বিশেষ পিটিশন দেওয়া হয়েছে।

১০ মে, ২০২১ কলকাতা হাইকোর্টে বার অ্যান্ড বেঞ্চ জানায় তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় কোনোভাবেই রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা ঘটেনি। মামলা যদিও আগে করেছে অনিন্দ্য সুন্দর দাস। দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে মারা যায় মোট ১১ জন।

১২ মার্চ, ২০২১ দি প্রিন্ট পোর্টালে খবর হয়, গত এক সপ্তাহে ভোট-পরবর্তী হিংসার শিকার হন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। স্থানীয় বিজেপি নেতারা আহত হন। বাড়িঘরে লুটপাট হয়। মেয়েদের উপর নির্যাতন করা হয়। ইতিমধ্যে অনেক মানুষ অসমে চলে যান। সংখ্যালঘুরা এই কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেয়। গুন্ডারা আইনের ভয়কে উপেক্ষা করে সন্ত্রাস করছে।

১৭ জুন ২০২১, 'ল বিট পোর্টালে প্রাবন্ধিক অভিষেক ত্রিবেদী হিংসার ঘটনা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যতগুলি মৃত্যু হয়েছে তার কোনো পিটিশন রিপোর্ট করেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

২১ জুন ২০২১, লাইভ 'ল.ইন ওয়েব পোর্টালে প্রকাশিত খবরে বলা হয় কলকাতা হাইকোর্ট মানবাধিকার কমিশন এনএইচআরসি-কে পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট দিতে বলেন। ১৮ জুন কলকাতা হাইকোর্ট মানবাধিকার কমিশনের বিশেষ কমিটি করার নির্দেশ দেন।

২২ জুন ২০২১ dailyhunt পোর্টালে সংবাদ প্রকাশিত হয় এক নারী ধর্ষণের খবর। টিএমসি গুন্ডারা বলে 'কালীমাতা ন্যাংটো তোকেও ন্যাংটো করব'। চাকু দিয়ে স্তনে কোপানো হয়। ওসমান নামক এক মুসলমান যুবক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ওই ঘটনায় চুপ থেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরের বরজ অঞ্চলে দক্ষিণ মহিষদা গ্রামে পরশুরাম দাস ও খোকন দাস-এর বাড়িতে ৪০-৫০ জন টিএমসি ডাকাত হামলা করে।

উত্তর ২৪ পরগনার গ্রামের ৩৪ বছরের পিংকি দাস তপশিলি সম্প্রদায়ের কমিশনে চিঠি দেন এই বলে যে ৫০ জন গুন্ডা বাড়িতে ঢুকে গালিগালাজ করে ধর্ষণের হুমকি দেয়। ৩ লক্ষ টাকার জিনিস লুঠ করে নেয়। প্রশাসন এফআইআর নিতে নারাজ ছিল।

১৪ জুলাই ২০২১, নিউজব্রেড সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয় যে ফলতায় অরিন্দম মিদ্যে বিজেপি করতেন বলে তাকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, প্রাক্তন বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ বর্মন থেকে ত্রিলোচন মাহাত, অনুপ রায়, মণীশ তিওয়ারি, দেবেশ বর্মন সহ সর্বমোট ৩৫০-এর অধিক রাজনৈতিক হত্যালীলার পাহাড় নির্মাণ করেছে এই তৃণমূল সরকার। দোষীদের চোখে মুখে ভয় নেই অথচ নিপীড়িত মানুষের মনে ভয় ও সন্ত্রাসের কঠিন আতঙ্কের বাতাবরণে সর্বত্র আচ্ছাদিত।

২ মে থেকে ৫ মে পর্যন্ত কেবলমাত্র নিজের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য খুন হয়েছেন— (১) শীতলকুচির মিন্টু বর্মন (এসসি সম্প্রদায়ভুক্ত), (২) শীতলকুচির মানিক মৈত্র, (৩) দিনহাটার হারাধন রায় (এসসি), (৪) রানাঘাট দক্ষিণের উত্তম ঘোষ, (৫) জগদ্দলের শোভা রানি মণ্ডল (এসসি), (৬) সোনারপুর দক্ষিণ হরণ অধিকারী, (৭) বেলেঘাটার অভিজিৎ সরকার, (৮) বোলপুরের গৌরব সরকার (এসসি), (৯) সিন্ধু-অরূপ রুইদাস, (১০) কেতুগ্রামের বলরাম মাঝি (এসসি), (১১) মথুরাপুরের সৌরভ বারুই (এসসি), (১২) ভাটপাড়ার আকাশ যাদব (ওবিসি), (১৩) ময়ূরেশ্বরের জাকির হোসেন (ওবিসি-বি), (১৪) সবং-এর বিশ্বজিৎ মহেশ (এসসি), (১৫) জামালপুরের কাকালী ক্ষেত্রপাল (এসসি), (১৬) বিনপুর-কিশোর মাণ্ডি (এসটি), (১৭) মোথাবাড়ির-মনোজ মণ্ডল, (১৮) মোথাবাড়ি-চৈতন্য মণ্ডল, (১৯) কোতুলপুরের কুশ ক্ষেত্রপাল (এসসি), (২০) বর্ধমান দক্ষিণের নারায়ণ দে, (২১) রায়নার দুর্গাবালা বাগ (এসসি), (২২) রায়নার ভাদু দাস (এসসি), (২৩) আমডাঙ্গার রঞ্জিত দাস, (২৪) নৈহাটির সন্তু মণ্ডল (এসসি), (২৫) নন্দীগ্রামের দেবব্রত মাইতি, (২৬) বারাসাতের জ্যোৎস্না মল্লিক (এসসি), (২৭) নলহাটির মনোজ জয়সওয়াল, (২৮) চাপড়ার ধর্ম মণ্ডল (ওবিসি), (২৯) ডায়মন্ড হারবারের অরিন্দম মিদ্দে (ওবিসি), (৩০) বাসন্তীর প্রদীপ বৈদ্য (এসসি), (৩১) সোনারপুর উত্তর নির্মল মণ্ডল (এসসি)। এই রকম মোট ৫৮ জনের প্রত্যক্ষ হত্যার সাক্ষী থেকেছে স্বামী বিবেকানন্দের পশ্চিমবঙ্গ। স্বাধীনোত্তরযুগে এমন পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণ হবে কেউ কল্পনা করেননি।

পরিশেষে বলতে চাই এই রকম রাজনৈতিক ধর্মীয় জেহাদি সন্ত্রাসের কথা আমরা যদি ভুলে যাই তাহলে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গ কখন পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হবে তা বুঝতে পারবো না। □

বাঙ্গালির ফ্যাসিবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা

অনুপম বেরা

গত বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের পরে যে রাজনৈতিক দাঙ্গার চিত্র আমরা দেখেছি, তা কি কোনো রাজনৈতিক দাঙ্গা? না কি সরলীকরণের পদ্ধতি? সরলীকরণ...কীসের জন্য। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট না দেওয়ার জন্য না কি...হিন্দু হয়ে এ রাজ্যে থাকার অপরাধে? ২ মে ২০২১ থেকে পরবর্তী ৪ দিন সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে ধ্বংসলীলা চললো, গোটা দেশ রাজসাক্ষী থাকলো। যা এখনও জীবন্ত। হাজার হাজার গ্রামের অত্যাচারিত হিন্দুরা সব কিছু হারিয়ে তারা এখনও ঘরছাড়া ও দিশেহারা। তখন ৪০-এর বেশি খুন হয়েছে। অসংখ্য মা ও বোন ধর্ষিত হয়েছে। মানুষ বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল কিন্তু রাজ্যসরকার পাশে নেই, আছে দাঙ্গাকারীদের জঘন্য শর্ত যা শুনে লজ্জায় মানুষ হিসেবে নিজেকে ধিক্কার জানাচ্ছি। কেউ চায় নিপীড়িতদের ওপর লোভ লালসা চরিতার্থ করতে, কেউ চায় অর্থ, কেউ চায় মুচলেকা, কেউ চায় মাথা মুণ্ডন করে প্রায়শ্চিত্ত। এ কোন পশ্চিমবঙ্গ?

অবাক হতে হয় যখন দেখি এই দাঙ্গাকারীদের বেশিরভাগ একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা হিন্দু নয়। আবার যারা অত্যাচারিত, তারা কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন, কিন্তু মজার বিষয় হলো তারা সকলেই হিন্দু। এই হিন্দু নিধনের কাজ আজও সমাপ্ত হলো না। সেই ৪৬-এর দাঙ্গা, 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নোয়াখালি দিয়ে শুরু।

গত ৭৫ বছর ধরে এরকম অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে হিন্দু বাঙ্গালি। সবই অদৃষ্ট। মনে হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মবলিদান অর্থহীন হয়ে পড়েছে। একদল আঁতেল বাঙ্গালি একটু একটু করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের বাইরের একটা দেশ হিসেবে উপস্থাপিত করছে। নিরন্তর ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে হিন্দু নিধন কর্মসূচি অব্যাহত।

৩৪ বছরের বাম সরকার ও ১০ বছরের তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের কিছু মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ ফ্যাসিবাদী বাঙ্গালিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। তথাকথিত বাঙ্গালি ধর্মনিরপেক্ষতার দল কোথায় যেন লুকিয়ে। সর্বদা যারা হিন্দু জননেতাদের ফ্যাসিবাদী বলে এসেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেই মুখোশগুলো নিজেরাই ফ্যাসিবাদী শব্দ টি নিজের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে। আজ হিন্দু বাঙ্গালি চরম বিপদের মধ্যে। হিন্দুদেরই এই মেকি ধর্মনিরপেক্ষদের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হবে। তা না হলে আর একটা বাংলাদেশ অবশ্যম্ভাবী। □

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ১৭ এপ্রিল বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির উদ্যোগে এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মধ্যভাগের অরবিন্দ উপনগরের

সহযোগিতায় শ্যামপার্ক সুভাষ বাগ শিশু উদ্যানের পাশে সিদ্ধেশ্বরী ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিগত করোনা মহামারী এবং বর্তমান গ্রীষ্মের দাবদাহে রক্তের সংকট মেটানো ও তার চাহিদা পূরণের জন্য আয়োজিত হয় এই রক্তদান শিবির। শিবিরে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বাগবাজার হরনাথ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত কাজি মাসুম আখতার এবং বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন মোহনবাগান লেনের শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত তেঁতুলতলা আশ্রমের প্রধান সেবক প্রভানন্দ দাস স্বামী মহারাজ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যভাগ সঙ্ঘচালক নরসিংহ ঘোষ তুলসীচারা প্রদান করে প্রভানন্দ দাস মহারাজকে সম্মানিত করেন। উল্লেখ্য যে, মহারাজ স্বয়ং রক্তদান করেন এবং সকলকে উৎসাহিত করে বলেন, শরীরের এই খোলসের কোনো দাম নেই যতক্ষণ তা অন্যের উপকারে না লাগে।। প্রধান অতিথি বাগবাজার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজী মাসুম আখতারের হাতে তুলসীচারা তুলে দেন সঙ্ঘের মধ্যভাগ সহ কার্যবাহ শুভঙ্কর কুণ্ডু। শ্রীআখতার বলেন, সমাজের সমস্ত ভালো কাজে সবার সহযোগিতা করা উচিত। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে আমি গৌরবান্বিত মনে করছি। শিবির পরিদর্শন করেন সঙ্ঘের সহ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে, বিশ্ব হিন্দু পরিশদের কেন্দ্রীয় সংগঠন মন্ত্রী শচীন্দ্রানাথ সিংহ, কলকাতা মহানগর কার্যবাহ বিভাষ মজুমদার, পূর্বতন মহানগর সঙ্ঘচালক সুশীল কুমার রায় প্রমুখ। শিবিরে স্বর্গীয়া সবিতা রানী কর্মকারের স্মৃতির উদ্দেশে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা কার্যক্রম এবং রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করার ব্যবস্থা করা হয়। সর্বস্তরের মানুষের জন্য থ্যালাসেমিয়া রোগ সংক্রান্ত আলোচনা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

রক্তদান শিবিরে ৮ জন মহিলা-সহ ৪২ জন রক্ত দান করেন। কয়েকজন মহিলাও রক্ত দান করেন। শিবির সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী রাপ্তি মুখার্জি। শিবিরে উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেছেন মধ্যভাগ সহ সঙ্ঘচালক অমর সিংহ, ভাগ কার্যবাহ চন্দন দাস, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহ-সভাপতি জীবনময় বসু প্রমুখ।

মহারাজা শশাঙ্ক স্মৃতি মঞ্চের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষের শুভ মুহূর্তে মুর্শিদাবাদের ব্রহ্মপুরে মহারাজা শশাঙ্ক স্মৃতি মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এক বিশেষ সভা। প্রায় দেড়হাজার বছর আগে ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক সিংহাসনে আরোহণ করলেও ঠিক তার তিন বছর পরে তাঁর রাজ্যভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর রাজ্যভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে মন্ত্রীবর্গ, পারিষদ ও স্ত্রী রূপাদেবীর অনুরোধে ৫৯৪ ক্রিস্টাব্দে (১৪২৮ বছর আগে)পয়লা বৈশাখ তিনি বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঞ্চের সভাপতি ও বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক বিনয়ভূষণ দাশ। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম, বেদ ও পুরাণ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মচারী গোপীনাথ বেদান্তী। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তা মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মধ্যবঙ্গ প্রান্তের প্রচার প্রমুখ সুশোভন মুখার্জি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা কার্যকর্তা দ্বিগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং বজরঙ্গ দলের বিভাগ প্রভারি প্রীতম দত্ত। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সভাশেষে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় ও পরমান্ন সহযোগে মিষ্টিমুখের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সিউড়ী রামকৃষ্ণ সভাগৃহে তারাশঙ্কর স্মারক বক্তৃতা ও তারাশঙ্কর স্মৃতি-পুরস্কার-২০২২

গত ১৭ এপ্রিল বীরভূম জেলার সিউড়ী রামকৃষ্ণ সভাগৃহে তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী এক সারস্বত সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রথম পর্বে বিষয় ছিল তারাশঙ্কর স্মারক বক্তৃতা, অরণ্য-অগ্নি পত্রিকার দ্বিতীয় প্রকাশ এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রদান। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার দুই সভাপতি বিপিন মুখোপাধ্যায় ও পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায়, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর-পৌত্র সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরভূমের সিউড়ী ছাড়াও আমোদপুর, লাভপুর, কীর্ণাহার, সাঁইথিয়া, বোলপুর থেকে শুরু করে নদীয়, দুর্গাপুর, কলকাতা এবং বালুরঘাট থেকে আগত সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী-সহ শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সভাটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের বিষয় সম্পর্কে বলেন, তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজ সমাজসেবামূলক একটি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। ২০১৮ সালে এর জন্ম। কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চা এহং তার বিস্তারের মধ্য দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন আমাদের মূল লক্ষ্য। বছরে বারো মাসের বারোটি অধিবেশনের মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ্যপথে নিবিষ্ট থাকার সচেষ্ট প্রয়াসে আমরা আন্তরিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুষ্ঠানে অরণ্য-অগ্নি সাহিত্য পত্রিকাটির উন্মোচন করা হয়। এবারের সংখ্যায় তারাশঙ্করের হারিয়ে যাওয়া একটি রচনা এবং বীরভূম ইতিহাসের উপেক্ষিত ঘটনার ইতিবৃত্ত যেমন মুদ্রিত হয়েছে, তেমনই রবীন্দ্র কবিজীবনের বাঁকবদলের নেপথ্য এক নতুন অধ্যায় যেখানে কবি নিবিড়ভাবে তারাশঙ্কর অনুপ্রাণিত, সেইসব কথাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আবার গীতার যুগোচিত যাজ্ঞিক-মাহাত্ম্যময় চিরন্তনতা বিষয়ে মননশীল নিবন্ধ যেমন আছে, তেমনই সভ্যতার মূল স্তম্ভ আদালত মহিমার ইতিহাস কাহিনিও রয়েছে এই সংকলনে।

এবারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন বীরভূমের প্রদীপ সিংহ। রৌপ্যনির্মিত গোলাধারে উপস্থাপিত রৌপ্যনির্মিত তারাশঙ্করের মুখমণ্ডল এই পুরস্কারের শিল্পরূপ নির্মিত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে গল্প ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন কবি পলাশ বর্মন ও কবি শ্রীমতী ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। সভা সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সুশান্ত রাহা। অধীর, অভয়, চন্দন, চৈতালি, পলাশ, পার্থ, বিধান, মিলি ও রাজীবের মতো উদ্যোগী তরুণ-তরুণীদের সহযোগিতায় সভা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বাংলা নাটকে পেশাদারিত্বের ছোঁয়া এনেছিলেন গিরিশচন্দ্র

কণিকা দত্ত

বাঙ্গালিকে নাটক করে সংসার চালানোর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মধুসূদন দত্তর ভাষায় 'অলীক কুনাট্য', যা দেখে 'মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে', সেই 'রঙ্গ'কেই জীবনের অঙ্গ করে নেওয়া গিরিশচন্দ্র প্রমাণ করে দিয়েছিলেন 'রং মেখে সং' সেজেও পেট চালানো যায়। কিন্তু ট্র্যাজেডি হলো বাঙ্গলার নাট্য জগৎ আজও পুঁজির পুটুলি হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ব্রিটিশরা চলে গিয়েছে সত্তর বছর হয়ে গেল। দাঙ্গা এলো, মহামারী এলো। নব নাট্য আন্দোলন এলো। বাংলা নাটক পৌরাণিক পোশাক পালটে ঘাম-রক্তের সংলাপ লিখল, প্রশাসকের প্রহার সহ্য করল, গোষ্ঠীবদ্ধ হলো, মুহুর্মুহু 'ফ্ল্যাশ' পড়ল, এক শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালকের গাড়ি বাড়ি হলো। কিন্তু বাঙ্গলার নাট্য জগত পুরোপুরি পেশাদারিত্বের পথে পা বাড়ানোর ঝুঁকি নিতে পারল কই।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ কিন্তু ফিটন গাড়িতে যাতায়াত করতেন। বড়োলোক বলে তাঁর সুনাম ও দুর্নাম দুটোই ছিল। বড়োলোকিয়ানাতেও তিনি ছিলেন সমান বোহেমিয়ান। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নামে রাস্তা হয়েছে। উদ্যান সেজেছে, মঞ্চ তৈরি হয়েছে, মূর্তি বসেছে, এমনকী পাতালেও গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাম মাহাত্ম্য বজায় রেখেছেন। মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ পাতালরেলের স্টেশনের নামকরণের সময় বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের এই পুরোধা পুরুষটিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেটা কি শুধু গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রীরামকৃষ্ণ অনুষঙ্গের জন্য? না তারও বেশি কিছু?

গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরের অম্ল-মধুর সম্পর্ক নিয়ে চর্চা কম হয়নি। ঠাকুরের কাছ থেকে 'ষোলো আনা' আদায় করে ছেড়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। আবার ঠাকুরও 'বকলমা' নিয়ে মায়াডোরে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছিলেন বেয়াড়া ভক্তটিকে।

না, সেইজন্যও শিবতুল্য মানুষটিকে নিয়ে এতগুলো বছর চর্চা করেনি বাঙ্গালি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বলেই যদি গিরিশ ঘোষ বাঙ্গালি মননে জায়গা করে থাকেন, তাহলে ঠাকুরের বাকি এগারো জন পার্শ্বচরের নাম গড়গড়িয়ে কেন বলতে পারে না তারা?

আসলে গিরিশ ঘোষ ছিলেন নিজস্ব নিয়মে চলা এক স্বাধীন পুরুষ। ধরা দিয়েছিলেন শুধু ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরও বুঝেছিলেন চিরদুঃখী, একাকী মানুষটার একটা বিষ ওগরানোর মতো গাছের শিকড় চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গিরিশের সেই বিষ ওগরানোর বৃক্ষ। না হলে পদে পদে সর্বসমক্ষে অপমানিত হয়েও কেন ঠাকুর বার বার ছুটে আসতেন গিরিশের কাছে। সেটা বুঝতেন মা সারদাও। মধ্যরাতে মদ্যপ গিরিশ পাড়া ফাটিয়ে 'মা' 'মা' বলে চিৎকার করলে, জানালা খুলে মা সারদা ছেলেকে দর্শন না দিয়ে থাকতে পারতেন না।

ছোটোবেলা থেকে মৃত্যুশোক তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে যে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে, তিনি কিন্তু স্বপ্ন দেখেছিলেন একটা জাতির আত্মসম্মান গঠনের। পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে কুরে কুরে খেতো।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা তো গিরিশচন্দ্র ঘোষই।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত গিরিশ ঘোষ বাংলা নাটকের জগতে বিরাজ করেছিলেন, গিরিশচন্দ্রের মতো একাধারে নট, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও সংগঠক পৃথিবীর নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে খুবই কম দেখা গেছে। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে আবেগের আতিশয্য অনেক সমালোচনায় প্রকাশ পেলেও অন্তত এটুকু বলা যায় যে, বাংলা নাট্য সাহিত্যে ও অভিনয়ে তিনিই প্রথম পেশাদারি মনোভাব নিয়ে আসেন। তিনিই প্রথম নাট্যাভিনয়কে একটি শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। নাট্যাভিনয়ের শিক্ষাকেও তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দেন যার ফলে অশিক্ষিত বারবনিতারাও অসামান্য অভিনেত্রীতে পরিণত হয়েছিলেন।

১৮৭২ সাল। ডিসেম্বর মাস, পেশাদার রঙ্গমঞ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল ন্যাশনাল থিয়েটার। শুরুতে অবশ্য অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় নিজেকে কিছুটা সরিয়ে রেখেছিলেন গিরিশচন্দ্র। পরে মান-অভিমান ভুলে এগিয়ে আসেন। এই সাধারণ রঙ্গালয়ে সাধারণ মানুষ 'দর্শনী'র বিনিময়ে নাটক দেখতে অভ্যস্ত হলো। এর আগে ধনীব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাটক মঞ্চস্থ হতো। দেখতে পেতেন মুষ্টিমেয় নির্বাচিত 'অতিথি'রা। সাধারণের প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না। সুতরাং, গিরিশচন্দ্রের প্রতি বাংলা থিয়েটার কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। পঞ্চরং, প্রহসন, রূপক, গীতিনাট্য প্রভৃতির সংখ্যাও অনুরূপ। অভিনয়, পরিচালনা,

থিয়েটার কোম্পানি চালানো, রিহার্সাল, আলাদা করে অভিনয়ের ক্লাস নিয়েও তিনি যে কী করে শতাধিক নাটক লিখেছিলেন, তা আজও বিস্ময়ের।

আগেই বলেছি গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন বাংলা নাটক লিখেছিলেন। প্রথম দিকে অবশ্য কিছু পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল। সেই পরিবেশও গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক লেখার অন্যতম কারণ।

বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতে স্বদেশপ্রেমমূলক নানা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে শুরু করলেন গিরিশচন্দ্র। 'সিরাজদৌল্লা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী', 'অশোক' প্রভৃতি নাটকে গিরিশচন্দ্র তার স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসবোধর পরিচয় দিলেন। নাটক যে একটি জাতিকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে রজনীর পর রজনী প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করে তা প্রমাণ করে দিলেন গিরিশচন্দ্র।

নিজের পান-দোষ থাকলেও নিটোল সংসারের স্বপ্ন দেখা গিরিশচন্দ্রকে পানাসক্তি, পারিবারিক বিরোধ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, কুমারী ও বিধবাদের নির্মম জীবনযাপন পীড়িত করত। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকটি সে যুগেও যেমন আজও তেমনই প্রাসঙ্গিক। নাট্যকারের মানবদরদি মনোভাবের প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ হয়ে আছে 'প্রফুল্ল' নাটকটি। এছাড়াও 'হারানিধি', 'বলিদান' প্রভৃতি নাটকে তৎকালীন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের কু-প্রথাগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

আরও একটি ঐতিহাসিক কাজ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। বাংলা নাটকের শরীর থেকে গীতিকবিতার আবরণকে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর নাটকে উঠে এলো দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের সাধারণ কথপোকথন। ফলে অশিক্ষিত দর্শকও নাটকের মর্মোদ্ধারে সক্ষম হলো। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন মধুসূদন দত্তর চোদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দ অভিনয়ের পক্ষে অসুবিধেজনক। তিনি তৈরি করলেন ছোটো ছোটো পঙ্‌ক্তির ছন্দ। যা 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিতি লাভ করল।

এখন প্রশ্ন, এত দুঃখের মধ্যেও (স্ত্রীর মৃত্যু, দুই কন্যার অকাল বিয়োগ) এত উৎসাহ, উদ্যোগ, সাহস কোথা থেকে পেলেন গিরিশচন্দ্র? একটাই উত্তর, শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই ছিলেন গিরিশচন্দ্রের নাটকের মূল পৃষ্ঠপোষক। গিরিশকে অভিনয় করে দেখিয়েও দিতেন ঠাকুর। তিনি যে লোকশিক্ষার প্রবর্তন দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীকে সামনে রেখে শুরু করেছিলেন, তাঁর প্রিয় গিরিশ সেই লোকশিক্ষাই দিয়ে চলেছে জনগণকে। যুক্তিনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করেছেন, আবার করজোড়ে আধ্যাত্মিকতার পাঠও নিয়েছেন।

বাঙ্গলার নবজাগরণের সলতে পাকানোর কাজটা গিরিশচন্দ্রই করে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর সেই কাজের প্রেরণাপুরুষ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যদি 'যুগাবতার' হন গিরিশচন্দ্রকে 'যুগশিক্ষক' বললে অত্যুক্তি হবে না। □

With Best Compliments from -

ZEN POLLEN SERA
Since -1983

ZEN POLLEN PAINTS (P) LTD.

Manufacturer Exporter & Importer

Office & Factory
51/52, Lock Gate Road,
Kolkata - 700 002
E-mail : sanjaydutta@yahoo.com
Website : www.zenpollenpaints.com

মোগল-পাঠানযুগেও বীর রাজা হিমু হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

হিন্দু শাসক বীর যোদ্ধা হিমু বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। তিনি ছিলেন দিল্লির সুলতান শেরশাহের বংশধর শেষ বাদশাহ মহম্মদ আদিল শাহের হিন্দু উজির। আদিল শাহ এই হিন্দু উজিরের উপর সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ করেছিলেন। হিমু দক্ষতার সঙ্গে সাম্রাজ্য পরিচালনা করে নিজেই সুলতানের সব ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন। হিমুর প্রতি সুলতানের এই অগাধ বিশ্বাসের জন্য আদিল শাহের অন্যান্য মুসলমান সর্দারেরা অসন্তুষ্ট ছিল। এরই মধ্যে হুমায়ুন ভারত আক্রমণ করে শাহ আদিলকে যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করে নেয়। কিন্তু আদিলের মন্ত্রী হিমু দিল্লিতেই রয়ে যান এবং সুযোগের প্রত্যাশায় থাকেন। তিনি গোপনে আফগান সর্দারদের সংগঠিত করে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে একত্রে দিল্লির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং মোগলদের হাত থেকে দিল্লি উদ্ধার করেন। তিনি শাহি তখত্ পদদলিত করে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। ভালোভাবে সৈন্য সংগঠিত করে তিনি নবতর ভাবে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়েন। যদিও সুলতান আদিল শাহের উজির থাকাকালীন বেশ কিছু মুসলমান বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। প্রথমেই তিনি আগ্রার দুর্গ দখল করে নেন। এ সময়ে মোগল সম্রাট আকবরের বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। আকবরের অভিভাবক ছিলেন উজির বৈরাম খাঁ। তিনি দিল্লিশ্বর হিমুর আগ্রার দুর্গ দখল করার সংবাদ পেয়ে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে হিমুর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। পানিপথের প্রান্তরে বৈরাম খাঁ ও হিমুর সেনাবাহিনী মুখোমুখি সংগ্রামে লিপ্ত হয়। হিমুর নেতৃত্বে সেনাদল বৈরাম খাঁকে কোণঠাসা করে বিজয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই সময়ে বিরুদ্ধদলের সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত একটি শর হিমুর চোখে বিদ্ধ হলে তিনি হাতির পিঠে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। হিমুর বাহিনী এই দুর্ঘটনায় নেতৃত্বহীন অবস্থায় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে রৈরাম খাঁর সেনাবাহিনী হিমুর সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিমুকে বন্দি করে বালক সম্রাট আকবরের সামনে হাজির করে। বৈরাম খাঁ আকবরকে নিজের হাতে হিমুর শিরশ্ছেদ করতে বলে। কিন্তু আকবর বীর হিমুকে হত্যা করতে রাজি হননি। তাই নিষ্ঠুর বৈরাম খাঁ নিজেই তরবারি দিয়ে কাপুরুষের মতো হিমুর শিরশ্ছেদ করে।

ভারতবর্ষের এক হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা বীর রাজা হিমুর আত্মবলিদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। হিমু জন্মগত ভাবে হিন্দু ছিলেন। সুলতানি আমলে নিজ পরাক্রমে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে সুলতান শাহিকে ধুলিসাৎ করে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে গৈরিক পতাকা উড্ডীন করেন এবং বীরের মতো প্রাণ বলিদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমনিভাবে হিন্দু রাষ্ট্রকে বিধর্মীদের কবল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে যারা বীরের মতো প্রাণ দিয়েছেন তাদের আজকের এই আত্মবিস্মৃত হিন্দু জাতি একরকম ভুলেই বসে আছে। এভাবেই বহু হিন্দু যোদ্ধার বীরত্ব গাথা আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এ যে পরবর্তী সময়ে বালক আকবর দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বৈরাম খাঁ তাঁর সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং বৈরাম খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সম্রাট আকবরের সংঘর্ষে বৈরাম খাঁ পরাজিত হলে আকবর তাকে হত্যা না করে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে বৈরাম খাঁ অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হন। □

রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ

দেবাশিস চৌধুরী

পান্থনিবাসের লনে সেই সন্ধ্যা থেকে একাকী বসে আছে রাই। এখন নিশুতি রাত, পাহাড়ের মাথা টপকে আকাশের বুকে জেগে থাকা পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দিয়েছে চারিদিক। শ্রান্ত শরীর চাইলেও তৃপ্ত মন আবেশের ঘোর কাটিয়ে উঠতে দেয় না তাকে। সেই ভোর থেকে শুধু তো দৌড়েই গেছে। হাওড়া থেকে সকালের ফলকনামা এক্সপ্রেস ধরে বালেশ্বরে নেমে গাড়িভাড়া করে সোজা চলে এসেছিল রেমুনায় গোপীনাথজীউর মন্দিরে। সংসার তাকে অনেক কিছু দিয়েছে, শুধু দিতে পারেনি শান্তি। স্বামী সরকারি অফিসার, একমাত্র মেয়ে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, তবুও রাইয়ের জীবনে কী যেন একটা নেই। সেই না-পাওয়া 'নেই'কে পাওয়ার খোঁজেই যে বারবার তার পথে নামা।

বালেশ্বরের রেমুনার কথা রাই প্রথম শুনেছিল তার গুরুদেবের মুখে। ক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউর কষ্টিপাথরের অপরূপ মূর্তিটি দর্শনের ইচ্ছা সেই থেকেই, অবশেষে আজ পূর্ণ হয়েছে তার মনোবাসনা। মনের মাঝে থেকে থেকেই ভেসে উঠছে সদ্য স্বপ্নপূরণের সেই সুখস্মৃতি। সকালে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে চলা পথে একটু এগিয়েই পৌঁছে গিয়েছিল মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারে। প্রবেশদ্বারের কপালে বড়োবড়ো ইংরেজি অক্ষরে লেখা 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ'। জুতো খুলে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে ব্যাকুল চিত্তে ছুটে যায় ক্ষীরচোরার মন্দিরে। পাঁচ-সাতটি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গর্ভগৃহের সামনে। উঁচু বেদীর উপর ফুট তিনেক উচ্চতার মিশমিশে কালো কষ্টিপাথরের স্ব-পার্ষদ মুরলীধারী দণ্ডায়মান। মাথায় সোনার মুকুট, হাতে রুপোর মকরমুখী বাঁশী, অঙ্গে শ্বেতশুভ্র রাজবেশ। গলায় গাঁদা ফুলের মালার ভিতর আছে একটি সাদা ফুল আর গোলাপের গোড়ে মালায় অপূর্ব লাগছে প্রভুকে। আজ বেশ ভিড় রয়েছে মন্দিরে, পুজো দিয়ে প্রসাদের ডালি হাতে ভিড়ের মধ্যেই একটু জায়গা খুঁজে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দেবতার দিকে। সে যেন ইহজগতে নেই, মন চলে গেছে কৃষ্ণলোকে। দু-চোখে আনন্দাশ্রুর ধারা বইছে, ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে চশমার কাচ। নিজের অজান্তেই তার সুরেলা গলা গুনগুনিয়ে উঠল— জুড়াইতে চাই, কোথা জুড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই...

কতক্ষণ যে ভাবালোকে ছিল নিজেও জানে না রাই। সংবিৎ ফিরতে দেখে আশেপাশের ভক্তরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অস্বস্তি এড়াতে প্রভুকে শেষবারের মতো প্রণাম করে ধীর পায়ে মন্দির থেকে নেমে আসে। সিঁড়ির পাশেই প্রদীপ প্রজ্বলনের জায়গা, ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রদীপ নিবেদন করে একে একে দেখতে থাকে নাটমন্দির, রাসমঞ্চ, দেওয়ালের গায়ে আঁকা ফ্রেস্কোগুলি। একসময় পা আটকে যায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের বেদীর সামনে। মনের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে অতীতের কথা। মায়ের হাত ধরে কীর্তন দলের সঙ্গে পথ চলা। কলেজ পাশ করার পর বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা। উপযুক্ত সময়কালে বিবাহ। সংসার তাকে সব উজাড় করে দিয়েছে, তবুও উদাসীমনে কীসের যেন অভাব।

অনেকটা সময় কাটিয়ে পরিতৃপ্ত মনে গাড়ির কাছে ফিরে আসে রাই। এখন যাবে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর। রাত্রিবাসের জন্য অগ্রিম বুকিং করা আছে ওটিডিসি-এর পান্থনিবাসে। আগামীকাল সকালে দেবাদিদেব-দর্শনান্তে ফিরে যাবে। বেশ কিছুদিন হয়তো কেটে যাবে স্মৃতি রোমন্থনে। কিন্তু তারপর আবারও সেই না-পাওয়া 'নেই'কে খুঁজে পাওয়ার অস্থিরতা প্রতিবারের মতো ফিরে আসবে, আবার বেরিয়ে পড়বে সে ইষ্টের সন্ধানে।

বাঙ্গালির অন্তর্জলি যাত্রা

জিষ্ণু বসু

বাঙ্গালি ভারতের নবজাগরণের কাণ্ডারি ছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে ভারতবর্ষ বন্দেমাতরম্ পেয়েছে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁকেছেন ভারতমাতা, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ পুনর্স্থাপিত করেছেন ভারতআত্মাকে, রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন জাতীয় সংগীত। সেই বাঙ্গালি আজ অন্তর্জলি যাত্রার পথে।

বাঙ্গালি হিন্দুর কাছে ২০২১-এর নির্বাচন সাধারণ কোনো খেলা ছিল না, ছিল জীবনমরণের লড়াই।

খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ, কালিয়াচকের থানা জ্বালিয়ে দেওয়া, দেগঙ্গা, ধুলাগড় বসিরহাটের দাঙ্গার পরে বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্বটাই বিপন্ন মনে হয়েছে।

১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে ব্রিটিশ বেঙ্গলের হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৪২ শতাংশ। এর সঙ্গে কোচবিহারের মতো দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যা যোগ করলে প্রায় ৪৬ শতাংশ বাঙ্গালি হিন্দু ছিলেন। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের আর বাংলাদেশের জনসংখ্যা মোট ২৩ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষের মাত্র ৩১.০৯ শতাংশ হিন্দু। ২০২১ সালের আদমসুমারির জন্য অপেক্ষা করার আগেই বলা যায় যে এই সংখ্যা ৩০ শতাংশের অনেক নীচে নেমে যাবে। বিগত মাত্র ৭০ বছরে কীভাবে একটা সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত, সম্পন্ন জাতির জনসংখ্যার ১৬/১৭ শতাংশের হ্রাস হয়ে গেল তার অনুভব এরাজ্যের মানুষেরা গত নির্বাচনের পর করেছে।

বাঙ্গালি হিন্দুর এমনই এক বিপদের সময় আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন। আরও ২৫০ বছর পরে রাজা রামমোহন এসেছিলেন বাঙ্গলার নবজাগরণের সূচনা করে। বিগত ৭০ বছরে যে হারে হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে তা যদি

ফ ঃ ৫

অব্যাহত থাকে, তবে আজ থেকে ২৫০ বছর পরে বাঙ্গালি হিন্দুর সংখ্যা ৬ শতাংশের মতো হবে। আর আজ থেকে ৫০০ বছর পরে মাত্র ১.২১ শতাংশ হয়ে যাবে। বাঙ্গালি হিন্দুর বিলুপ্তির এই হিসেব কোনো জ্যোতিষীর হিসেব নয়, সাধারণ গুণোত্তর পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হিসেব। সমাজবিজ্ঞানীদের হাতে যেসব 'কারেকশন ফ্যাক্টরি' থাকে, তাতে একটু আধটু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু মূল অঙ্কটা মোটামুটি একই থাকবে।

এই বিপন্নতার অনুভব গ্রামের মানুষ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে করেছেন। শহর কলকাতা আর তার সংলগ্ন মানুষ, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা করেননি। কিন্তু মানুষের মতামতে স্পষ্ট যে তারা বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চিন্তিত। বিধানসভায় ৭৭টি আসনে বিজেপি জয়লাভ করেছে। নন্দীগ্রামের মতো যেখানেই প্রার্থীরা হিম্মতের সঙ্গে পুনর্গণনা করাতে পেরেছেন, সবকটিতেই ভারতীয় জনতা পার্টির জয় হয়েছে।

১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিরোধী দলনেতা জ্যোতিবসুর সঙ্গে ২৮ জন বিধায়ক ছিলেন। ১৯৭৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিধানসভাতে বিরোধী দলনেতা জনতা দলের প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সঙ্গে ছিলেন ২৯ জন বিধায়ক। সে বছর কংগ্রেসের ২০ জন বিধায়ককে যুক্ত করলেও সংখ্যাটা ৪৯ হতো।

২০০১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রিত্বে গঠিত বিধানসভাতে বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন ৬০ জন বিধায়ক। ২০০৬ সালে তা অর্ধেক হয়ে হয়েছিলেন ৩০ জন। তাই এবারের বিরোধী নেতা ভারতীয় জনতা পার্টির শুভেন্দু অধিকারী এ রাজ্যের ইতিহাসের সর্বোচ্চ সংখ্যা নিয়ে বিধানসভার বিরোধী নেতা হয়েছেন। রাজ্যের মানুষ ভোট দিয়ে তার সঙ্গে ৭৭ জন বিধায়ককে বিধানসভাতে পাঠিয়েছেন। যা এরাজ্যের সর্বকালের রেকর্ড।

কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হলো গত বছর মে মাসে। এত রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ভারতের আর কোথাও নেই। তার আগের বছর বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জোট জিতেছে, কতজন মানুষ নির্বাচনোত্তর হিংসাতে মারা গেছেন? একজনও নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে বিজেপি জোট হেরে গেল। সেখানেও একজন মানুষ মারা যাননি। দেশের মধ্যে আমরাই সবথেকে সংস্কৃতিবান। তাই আমাদের বিদ্বজ্জন, সাংবাদিক, বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের বা উচ্চশিক্ষিত দেশের গর্ব যেসব উচ্চপদস্থ যেসব সরকারি আধিকারিক, কারোর লজ্জা হয় না।

অত্যাচারের বিচারের শুনানির গুরুদায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন সুপ্রিমকোর্টের মহামান্য বিচারপতি ইন্দিরা ব্যানার্জি। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফল যেদিন ঘোষণা হলো, সেদিন সন্ধ্যায় শহর কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে লোহার রড দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, তরতাজা যুবক অভিজিৎ সরকারকে। সেই মামলার শুনানি থেকেই সরে গিয়েছিলেন বিচারপতি।

মহমান্য কলকাতা হাইকোর্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে রাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী হিংসার ঘটনার সত্যাসত্য বিচার করে বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছিলেন।

আজকের পৃথিবীতে গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ বহু চর্চিত হয়। রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যম। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেল, যে বিচার ব্যবস্থা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের বাকি স্তম্ভগুলির কোনো শক্ত ভিত নেই।

একমাত্র বিচারব্যবস্থায় অনুভূত হয়েছে যে বাঙ্গালির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তাই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সর্বত্র আলোড়ন উঠেছিল।

সব থেকে লজ্জাজনক ভূমিকা নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম। এক সাংবাদিক সম্মেলনে পালটা প্রশ্ন করা হয়েছিল সাংবাদিকদের। 'আপনারা কি হিংসা দেখেছেন?' সকলে চুপ করে ছিলেন। ২ মে পর থেকে ৩২ জন রাজনৈতিক কর্মী খুন হয়েছেন, এত মানুষ ঘরছাড়া, এত মহিলার সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে, ত্রাণ শিবিরগুলিতে করোনার আবহে এত মহিলা, শিশু নরকের জীবনযাপন করছেন। এসব কলকাতার সাংবাদিকরা কিছুই দেখেননি। কারণ তাদের কেবল এরাজ্যের উন্নয়ন আর ভিনরাজ্যের দুর্নাম করার জন্যই নিয়োগ করা হয়েছে। ভাবতে লজ্জা লাগে এই কলকাতা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজের সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের শহর!

সবচেয়ে বেশি উপদ্রুত অঞ্চলগুলির মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার উদাহরণ দেওয়া সবথেকে উপযুক্ত হবে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই হিন্দুদের উপর লাগাতার অত্যাচার হয়েছে ওখানে। ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ ও মেটিয়াবুরুজ— এই সাতটি বিধানসভা নিয়ে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা। এই সবকটি বিধানসভাই রক্তস্নাত হয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে গ্রামের পর গ্রাম থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বর্বরোচিত ঘটনার বিবরণ জাতীয় সংবাদমাধ্যমে এসেছে কিন্তু কলকাতার বাংলা খবরে আসেনি। কোনও নৃশংসতা, কোনও অপরাধই এগিয়ে থাকা সংবাদমাধ্যমের প্রভুভক্তি টলাতে পারেনি। লোকসভা ভোটের পরে শাসকদলের এক নেতার কর্মীসভার রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'কেন হিন্দুদের ভোট দিতে দেওয়া হলো?'

এইসব ভয়ানক অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে ধীরে ধীরে এলাকাটি মধ্যযুগীয় বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছে। একের পর এক হত্যা হয়েছে কোনো বিচার হয়নি। অপরাধী অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে। কেউ অভিযোগ করলে পালটা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই ডায়মন্ড হারবারের কথা প্রশাসনের কারো অজানা নয়। বাঙ্গালির অন্তর্জলি যাত্রার সময় এনারা ঠিক কি ভূমিকা নিয়েছিলেন সেটাও একদিন লেখা হবে।

কারণ সত্য স্বপ্রকাশ। সত্যকে সকলের কাছ থেকে চিরকাল লুকিয়ে রাখতে কেউ পারেনি আর পারবেও না। বাঙ্গালির উপর নিপীড়নের কথা ইংরেজ চাপা দিতে পারেনি, পূর্বপাকিস্তানের খান সেনারাও পারেনি, গত বছরের ঘটনাও একদিন সবিস্তারে প্রকাশিত হবে।

গত বছর ৭ মে ফলতা বিধানসভার চককৃষ্ণ রামপুর গ্রামের এক প্রান্তিক চাষি সুকুমার মণ্ডল আত্মহত্যা করলেন। সুকুমার বিজেপির নেতা ছিলেন। পার্শ্ববর্তী বেনিয়াবাটি ও চককৃষ্ণ রামপুর নিয়ে ২০১ ও ২০২ নম্বর বুথ। ৬ মে বৃহস্পতিবার শাসকদলের চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের হার্মাদবাহিনী বাড়িতে বাড়িতে হুমকি দিতে বের হয়। এই বুথে তাদের প্রাপ্ত ভোট কম হওয়ায় অনুমানের ভিত্তিতে হুমকি চলছিল। মৃত সুকুমার মণ্ডল খুব গরিব। সেদিন তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। তার স্ত্রী ও মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বলে শাসিয়ে যায় ওই গুন্ডাবাহিনী। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ওই গরিব প্রান্তিক চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

গত বছর ২ মে-র পর থেকে ফলতা-সহ প্রায় সবকটি বিধানসভাতেই অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়।

ফলতা বিধানসভার ফলতা অঞ্চলের পাচলোকী গ্রামের বছর চল্লিশের যুবক অরিন্দম পুরকাইত। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মা ও ছেলের সংসার, এক বোন, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। অরিন্দমের নেতৃত্বে গত বিধানসভা নির্বাচনে পাচলোকি গ্রামে বিজেপি এগিয়ে থেকেছে। ভোটের পরে শাসকদল আশ্রিত সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতীরা অরিন্দমকে তুলে নিয়ে যায় এবং প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন করে। এরপর থেকে প্রতিনিয়ত হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ১৫ মে রাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে অরিন্দম।

২৯ মে একান্ত প্রয়োজনে সকাল ৮টার সময় ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার সাধুরহাট বাজারে আসেন রামনগর থানার নালা গ্রামের বছর তিরিশের বিজেপি কর্মী রাজু সামন্ত। শাসকদলের সমর্থকদের গণপিটুনিতে ঘটনাস্থলে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এই নিদারুণ ঘটনার প্রতিবাদ করতে পরেরদিন ৩০ মে আশেপাশের চার পাঁচটি গ্রামের সাধারণ গ্রামবাসী একত্রিত হন। প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল। কারোকে মারধর করা হয়নি, সরকারি বা বেসরকারি কোনো সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সেদিনই বিকেল থেকে ওই গ্রামবাসীদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। মোট ২৭ জন গ্রামবাসীকে জামিন অযোগ্য ধারাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই গ্রেপ্তার হওয়া প্রায় সকলেই তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষ।

রাজনৈতিক কারণ চরিতার্থ করতে হাজতে আটকে রাখার প্রক্রিয়া যাবৎ এই লোকসভা এলাকায় চলছে। গত বছর ১১ মে ডায়মন্ড হারবার জেল হেপাজতে মৃত্যু হলো স্বপন মণ্ডলের। একনিষ্ঠ বিজেপি কর্মী স্বপন মণ্ডলকে গত ৩ এপ্রিল ফলতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

৩ মে মগরাহাটের সৌরভ বর আর ১৬ মে বিষ্ণুপুরে গৌর দাস একইভাবে নৃশংসতার বলি হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে কেবল ডায়মন্ড হারবার লোকসভাতেই এতজন মানুষের প্রাণ গেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, মেদিনীপুর বা কোচবিহারের এক একটি বিধানসভা ধরে ধরে এমন অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া যায়।

৫ মে যখন মন্ত্রীসভা শপথ নিচ্ছে তখন দাউদাউ করে জ্বলছে দক্ষিণের ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ থেকে উত্তরের চোপড়া, দিনহাটা। সর্বত্র একই চেহারা। ভাঙড়, গোসাবার মতো বহু জায়গায় বুলডোজার দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর হিন্দুদের ১ থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে ঘরে ফিরতে হয়েছে। অনেকটা 'জিজিয়া কর' আদায়ের মতো। যারা জরিমানা দিতে পারেনি তাদের বাড়ির মেয়ে বউদের কয়েক ঘণ্টার জন্য নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অসম্ভব লজ্জার কথা শত শত মানুষ বলতে পারেননি। কিন্তু অনেক সাহসী হিন্দু এফআইআর করেছেন, ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়েছেন। এই সাহস বাঙ্গালি হিন্দুর অন্তর্জলি যাত্রার পথে একমাত্র আশার আলো।

মানিকতলা বিধানসভার অভিজিৎ সরকার। বছর পঁয়ত্রিশের ছেলেটি কলকাতা পৌরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। একদম তরতাজা প্রাণবন্ত ছেলে। রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর, বেড়াল খুব ভালোবাসত। বস্তির বাড়ির মধ্যেই একটা ছোট্ট এনজিও করেছিল। এবার নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কল্যাণ চৌবের সমর্থনে খুব খেটেছিল অভিজিৎ। বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তার বাড়ি আক্রান্ত হলো। তার এনজিও ঘরে রাখা কুকুরের ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে আক্রমণকারীরা। সেই মর্মান্তিক কাহিনিই সে ফেসবুক লাইভ করে জানাচ্ছিল। কিন্তু আরও মর্মান্তিক পরিণাম যে তার জন্য অপেক্ষা করছে, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে অভিজিৎ তো মুক্তি পেয়ে গেছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গেও দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে পূর্ববঙ্গের বাস্তব। আজকের ক্ষমতার চিটেগুড়ে লুটোপুটি খাচ্ছেন যেসব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, সংবাদমাধ্যমের সুবোধ বুদ্ধিজীবীরা, যেইসব মহান প্রতিভাবান শিল্পীরা 'অন্য কোথাও যাবো না' বলেছিলেন, কলকাতার যেসব উচ্চশিক্ষিত মানুষ আরবান নকশালদের ফাঁদে পড়ে # No vote for BJP বলেছিলেন তাঁরা তো এরাজ্যে বেঁচে থাকবেন। তারা পূর্ববঙ্গের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিজেদের চোখে দেখবেন। রাজশাহীর ইলা মিত্রের ঘটনা, চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর হত্যার মতো ঘটনা নিজেদের চোখে দেখবেন। বাড়ির দালানের থামে পুরুষদের বেঁধে এক এক করে মেয়েদের চোখের সামনে গণধর্ষিতা হতে দেখে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা এপারে পালিয়ে এসেছেন। প্রাণবন্ত অভিজিৎকে আর এইসব মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে হবে না। ও অবোলা পশুদের সেবা করত, মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াত, তাই ভগবান পশুপতিনাথ ওকে এসবের আগেই নিজের কাছে ডেকে নিয়ে গেছেন। ◻

সবুজ খাম, ডাক বাক্স আর বনশ্রীময় বিকেল

হিন্দোল সারেঙ্গী

লেক গার্ডেন্সের পঞ্চম স্টুডিয়োর ক্যামেরার সামনে বসে বনশ্রীদি মানে সংগীতশিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্ত। বেসরকারি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছেন। সঞ্চালনা করছেন সংগীত পরিচালক সৌম্য বসু। ২০০৯-এর সেই সময়ে সৌম্যদার সুরে অনেকগুলি অ্যালবামে গান গেয়েছিলেন বনশ্রীদি। কথায়-গানে-আড্ডায় সেদিনের সাক্ষাৎ বেশ জমে উঠেছিল। আমি সেদিন রেকর্ডিং ফ্লোরে ক্যামেরার পিছনে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের ভূমিকায়। 'আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম।' কালজয়ী বাংলা আধুনিক গানটির প্রসঙ্গ উঠলো। বনশ্রীদি বললেন, 'সে সময় একটু-আধটু নাম হয়েছে আর কী। তখন তো আর ই-মেল, মোবাইলের যুগ ছিল না। অনুরাগী মানে ফ্যানেরা বাড়িতে চিঠি পাঠাতো। একদিন এনটি ওয়ান স্টুডিয়োতে শ্যামলদার সঙ্গে দেখা হলো। বললাম, শামলদা, বাড়িতে কত অনুরাগী চিঠি পাঠায়। কত সুন্দর লেখা। এর উপরে একটা গান লেখো না! শ্যামল ঘোষও তখন বেশ নামি গীতিকার। বললেন, তা কীরকম খামে চিঠি আসে। আমি বললাম, লাল-সুবজ-নীল কতরকম রঙিন খাম। কত বাহারি লেখার কালি।' বনশ্রীদির অনুরোধে শ্যামল ঘোষ বিখ্যাত গানটি লিখেছিলেন। প্রবীর মজুমদারের সুরে দুর্গাপুজোয় রিলিজ হওয়া গানটি আজও জনপ্রিয়।

বনশ্রীদির গায়কীর সঙ্গে আমায় পরিচয় তারও আগে ২০০৬-এ এক শীতের মরশুমে। কলেজের এক্সকারশানে সেবার সুন্দরবন গিয়েছিলাম। সেখানে সন্ধ্যার আড্ডায় আমাদের এইচওডি গেয়েছিলেন 'সুন্দরবনে সুন্দরী গাছ, সবচেয়ে সুন্দর সেই যে গাছ' গানটি। শিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্ত।

বনশ্রীদির জন্ম হুগলির চুঁচুড়ায়। বাবা শৈলেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী। ছোটোবেলা থেকে পারিবারিক সংগীত আবহেই বড়ো হয়ে ওঠা। বাবার কাছেই প্রথম গানের তালিম নেওয়া। পরে শান্তি সেনগুপ্তকে বিয়ে করে কলকাতায় চলে আসেন বনশ্রীদি। কলকাতায় এসে নাড়া বাঁধলেন সুধীন দাশগুপ্তর কাছে। আরও অনেকের কাছেই পরবর্তীকালে গান শিখেছিলেন। কিন্তু একটানা ২০ বছর গানের তালিম নিয়েছিলেন সুধীনবাবুর কাছে। বহু বাংলা ছবিতে গান গেয়েছেন। কয়েকশো গান রেকর্ড করেছেন। ১৯৭৬ সালে তপন সিংহের হারমোনিয়াম ছবিতে মান্না দে-র সঙ্গে প্লেব্যাক করেছিলেন। 'ময়নামতির পথের ধারে' গানটি জনপ্রিয় হয়েছিল।

জীবনে অনেক পুরস্কার সম্মাননা পেয়েছেন। সঙ্গে বহু মানুষের ভালোবাসা। শ্রীকান্ত আচার্য বলতেন, 'মাটির প্রতিমা'। মাটির প্রতিমা কিনা জানি না, তবে মাটির মানুষ ছিলেন বনশ্রী সেনগুপ্ত। ফ্লোরে শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে নানান মজার কথা বলতেন। তাঁর স্বামী শান্তি সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। যেখানেই যেতেন সঙ্গে থাকতেন শান্তিদা। বনশ্রীদির কথায় একটু 'ট' আর 'ড' দোষ ছিল। আবার এই মানুষটাই যখন গান গাইতে শুরু করতেন, সেসব কোথায় উধাও হয়ে যেতো। শান্তি সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর শেষের দিকে ভীষণ একা হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে নির্মলা মিশ্র ও অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দারুণ সখ্য ছিল। রবীন্দ্রসদনে গানমেলায় দেখতাম এই ত্রয়ী পাশাপাশি বসে। নির্মলাদি নিজের পানের বাক্স থেকে পান বের করে অন্য দুজনকে দিচ্ছেন। 'তুই যে আমার চাঁদের কণা', 'ছিঃ ছিঃ ভালোবেসে', 'মন যেতে চায় একবার', 'জাত জাত করবো কেন'— ছায়াছবির গানগুলো বনশ্রী সেনগুপ্তর সংগীত জীবনের মাইলস্টোন। অন্যান্য বহু গানের মধ্যে ১৯৭১ সালে মুক্তি পাওয়া বাংলা ছায়াছবি 'অর্চনা'য় মাধবী মুখোপাধ্যায়ের লিপে 'দূর আকাশে তোমার সুর' গানটি সুপার হিট হয়েছিল। সুরকার ছিলেন অজয় দাস। স্বর্ণযুগের সংগীত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম কিংবদন্তী ছিলেন বনশ্রী সেনগুপ্ত। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গীতিকাররা তার জন্য গান লিখেছেন। সুধীন দাশগুপ্ত, শ্যামল মিত্র, নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়দের মতো কিংবন্তী সুরকারদের সুরে গান গেয়ে বাংলা সংগীত জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন বনশ্রী সেনগুপ্ত। □

বিস্ময় বালকের কীর্তিতে অবাক বিশ্বের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে বয়সে ছেলে-মেয়েরা অবসর পেলেই মোবাইল গেমে বুঁদ হয়ে থাকে অথবা কার্টুন নেটওয়ার্ক, পোগো চ্যানেলের কার্টুন শো ছেড়ে উঠতে চায় না, সেই বয়সেই মহাকাশ বিজ্ঞানের ওপর বই লিখে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কলকাতার বিস্ময় বালক রেয়াংশ দাস। মাত্র দশ বছর বয়সের রেয়াংশ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের মতো কঠিন বিষয়ের ওপর গোটা একটি বই লিখে ফেলেছে যার নাম 'আওয়ার ইউনিভার্স ঃ দ্য পাস্ট, দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড দ্য ফিউচার'। বইটিতে রয়েছে নক্ষত্রের জীবনচক্র, সৌরজগৎ, ডার্ক ম্যাটার, ব্ল্যাক হোল, ডার্ক এনার্জি-সহ জ্যোতিষ্কলোকের একাধিক বিষয়ে গূঢ় আলোচনা। বিগব্যাং থিয়োরি আলোচনা করতে গিয়ে রেয়াংশ সেখানে একাধিক ইউনিভার্স থাকার কথা উল্লেখ করেছে। এক একটি নক্ষত্র পৃথিবীর চেয়ে বয়সে কত বড়ো হতে পারে রয়েছে তার নিখুঁত গণনাও।

গড়িয়ার বাসিন্দা খুদে রেয়াংশের সব দুধের দাঁত হয়তো এখনো পড়েনি অথচ তার মহাবিশ্বের জটিল থিয়োরি নিয়ে আলোচনা করার আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। তার মা সোহিনী রাউথ জানিয়েছেন, '' প্রথমে রেয়াংশ ট্যাব নিয়ে খেলত। এরপর অ্যাস্ট্রোনমি ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের উপর নান ভিডিয়ো দেখতে শুরু করে। পাঁচবছর বয়স থেকেই ফিজিক্সের নানা থিয়োরি তার মুখস্থ।" বিশেষজ্ঞদের কাছেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রেয়াংশকে। তাঁরা রেয়াংশের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তার প্রত্যেকটি কথাই ছিল সঠিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত।

আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ছোটো থেকেই টানতো রেয়াংশকে। এক সময় হাতে ধরা ট্যাবের স্ক্রিনে মহাবিশ্বের নানা ঘটনা তার অনুসন্ধিৎসু মনকে নাড়া দিয়ে যায়। রেয়াংশ গুগলের সার্চ ইঞ্জিনে খুঁজতে থাকে মহাকাশ সম্পর্কিত নানা ভিডিয়ো। চোখের সামনে দৃশ্যমান হতে থাকলো সৃষ্টি রহস্যের নানা দিক।

রেয়াংশের নিজের কথায়, '' তারাভরা আকাশ দেখে আমার মনে প্রশ্ন আসতো আলোর বিন্দুগুলো আসলে কী? আর আমি এদের মাঝে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।" এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সে তিনবছর ধরে অসংখ্য বই পড়েছে। তারপর সাতবছর বয়সেই বই লেখার তাগিদ অনুভব করে রেয়াংশ। রেয়াংশের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সম্পর্কিত বইটি প্রকাশ পেয়েছে গত বছর। বইটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাজন। পাঠকদের হাতে আসার পর থেকেই বইটি নিয়ে ব্যাপক হইচই শুরু হয়ে যায়। কেউ বলছেন 'অসাধারণ'। কেউ

বলছেন 'অভিভূত'।

গবেষক নন্দিতা রাহা রেয়াংশের বইটি পড়ে জানিয়েছেন, ''মহাবিশ্ব সম্পর্কে রেয়াংশের ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার।" নিজের লেখা বই নিয়ে রেয়াংশ বলেছে, '' আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করতেই এই বই লিখেছি। আমার মনে হয় যত বেশি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি, স্পেস, গণিত ও বিজ্ঞানের মতো বিষয় জানবে ততই সভ্যতার চাকা মসৃণভাবে ঘুরবে। আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও বন্যার মতো বড়ো সমস্যাগুলি থেকে সতর্ক থাকতে পারবো।"

আমাজনের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে হু হু করে বিক্রি হচ্ছে রেয়াংশের বই। মহাকাশ বিজ্ঞানের জটিল বিষয় সহজভাবে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে বর্ণনা করা হয়েছে বইটিতে। তার লেখা বই নিয়ে পাঠকমহলে যে এত চর্চা হচ্ছে তাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না গড়িয়ার বিস্ময় বালক। এখন পরবর্তী বই লেখা নিয়ে ব্যস্ত রেয়াংশ। তার পরের বইয়ের বিষয় গণিত।

ধূলি

ধূলির প্রভাব বোধ হয় অনেকের নিকট অপরিচিত। আমাদের কাছে ধূলি জঞ্জাল বলে পরিচিত, কেবল জিনিসপত্র ময়লা করে, পরিচ্ছন্ন থাকতে দেয় না; যখন পথে বের হই, তখন ধূলি বায়ুবেগে আমাদের নাকে-মুখে গিয়ে আমাদের

বিব্রত করে তোলে। ধূলির জ্বালায় শহরের রাজপথে গ্রীষ্মকালে বের হওয়া মাঝে মাঝে দুর্ঘট হয়ে ওঠে। এমনকী বড়ো বড়ো শহরে এই ধূলির উৎপাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অর্থ ব্যয় ও নানা ব্যবস্থা নিতে হয়। কিন্তু ধূলি শুধু উৎপাত নয়। ধূলি দিয়ে অনেক বড়ো কাজ সম্পাদিত হয়।

অনেকের হয়তো মনে হয়, রাস্তায় ও ময়লা জায়গায় কেবল ধূলি রয়েছে। সে ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। আমাদের বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা সব জায়গায় রয়েছে। যে বায়ুরাশি পৃথিবীকে ঢেকে রয়েছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলছি। বায়ুমণ্ডলের কোথাও এমন নির্মল অংশ দেখা যায়নি যেখানে ধূলি নেই। কেবল যে ঝড়বাতাসের সময় বায়ু ধূলিভর্তি হয় তা নয়। বায়ু যতই নির্মল, যতই পরিচ্ছন্ন হোক না কেন, এতে সবসময় ধূলিকণা রয়েছে। শহর ও গ্রামের বায়ুর তো কথাই নেই, নির্জন প্রান্তরে, নিবিড় অরণ্যে, সুবিশাল সমুদ্রের উপরে, উঁচু পাহাড়ের উপর সব জায়গায় ধূলি রয়েছে। বেলুন চড়ে মহাকাশে গেলে সেখানেও ধূলির অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে সব জায়গায় ধূলির পরিমাণ সমান নয়। শহরে বা কলকারখানার কাছাকাছি বায়ুধূলি খুবই দূষিত হয়। পাহাড়ের উপর, সমুদ্রের উপর, জনশূন্য জায়গার বায়ু তুলনায় বেশ নির্মল।

ঘরের ভেতরে বায়ু সচরাচর নির্মল মনে হয়। জানালা বন্ধ করলে তার ফাঁক দিয়ে যদি সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে তবে দেখা যায়, রশ্মিপথে অসংখ্য ধূলিকণা ভাসছে। সাধারণভাবে এদের দেখা যায় না। অনেক সময় না-দেখা এই সামান্য ধূলিকণা উপর আমাদের জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, এই সামান্য ধূলিকণারও অসামান্য গুণ রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণার জন্যই আকাশ নীলবর্ণের দেখায়। ধূলিকণার জন্যই আগুনের শিখাকে বর্ণময় দেখায়।

বায়ুতে যে সকল ধূলিকণা ভাসে, এদের মধ্যে অনেকগুলি সজীব জীবাণু। এদের জীবন আছে। তালের বা খেজুরের রস কিছুক্ষণ রোদে রেখে দিলে তা থেকে ফেনা উঠতে থাকে এবং এতে মাদকতা জন্মে। ওই রস থেকে মদ তৈরি হয়। এই কাজ ওই সকল ধূলিকণা সম্পন্ন করে থাকে। তালরস ও খেজুর রসে চিনি থাকে। বায়ুর সজীব ধূলিকণা ওই রসে পড়ে চিনি খেতে থাকে। ধীরে ধীরে এদের সংখ্যা বাড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'দশটি সজীব ধূলিকণা থেকে দু'দশ লক্ষ সজীব ধূলিকণার জন্ম হয়। এই জীবাণু ছাড়া রস মদে পরিণত হয় না।

জীবসমূহের মৃত্যু হলে কিছুক্ষণ পরে এদের শরীর পচতে থাকে। ধূলির প্রভাবেই জীবদেহে পচন ধরে। সজীব ধূলিকণায় শুধু মদ উৎপত্তি হয় না, শুধু জীবনহীন শরীর পচে নষ্ট হয় না, সজীব ধূলিকণা জীবনহীন দেহের মতো সজীব দেহও আক্রমণ করে। এই সকল জীবাণু মোটেই নিরীহ নয়। সত্যি বলতে কী, এরা ছাড়া মানুষের তেমন শত্রু আর নেই। এরা কোনোভাবে জীবদেহে ঢুকতে পারলে নানা রোগের উৎপত্তি ঘটায়। এরা শরীরের ভেতরে গেলে এবং সেখানে বংশবৃদ্ধি হতে থাকলে মানুষ সহজে নিষ্কৃতি পায় না। মানুষের অনেক অসুখ এই ধূলিকণা থেকেই উৎপন্ন হয়। এদের আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। কেউ একরকম জ্বর সৃষ্টি করে, কেউ হাম, কেউ ধনুষ্টঙ্কার, কেউ বসন্ত, কেউ যক্ষ্মা, কেউ কলেরা ইত্যাদির কারণ হয়ে ওঠে।

এই সকল জীবাণু কেবল বায়ুতে থাকে না। জলেও থাকে। জল ও বায়ু আমাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। অতি নির্মল জল ও বায়ুতেও ধূলিকণার সঙ্গে এই প্রাণসংহারক জীবাণু থাকতে পারে। এরা মানুষ ছাড়াও পশু-পাখির শরীরেও রোগ সৃষ্টি করে।

অনেকে মনে করে, বাতাস ঠাণ্ডা হলেই কুয়াশা ও মেঘ সৃষ্টি হয়। এই ধারণা একশোভাগ ঠিক নয়। বায়ুর ধূলিকণা কুয়াশা ও মেঘ সৃষ্টির একটি কারণ। কেবল বায়ু ঠাণ্ডা হলেই কুয়াশা হয় না। তাতে ধূলিকণা থাকা চাই। এক একটি ধূলিকণার আশ্রয়ে এক একটি জলকণার সৃষ্টি হয়। যতগুলি ধূলিকণা থাকে, ততগুলি জলকণাও থাকে। বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে, ধূলিকণার আশ্রয় না পেলে অতি ঠাণ্ডাতেও বাষ্প জমে জলকণা সৃষ্টি হতে পারে না।

এখন বোঝা গেল, সামান্য ধূলিকণার কত কাজ। তা শূন্য আকাশ নীলবর্ণ করে। দীপশিখাকে বর্ণ দেয়। এরা অনেকে সজীব। এদের জাতি বিভাগ, জন্ম-মৃত্যু আছে। এরা খাবার খায়। এরা রোগ সৃষ্টি করে। শবদেহ গলিত ও লুপ্ত করে। কুয়াশা ও মেঘ সৃষ্ট করে। এরা না থাকলে মেঘ হতো না, বৃষ্টি হতো না। জীবের বেঁচে থাকাও সম্ভব হতো না। একবার ভেবে দেখ, সামান্য ধূলিকণা থেকে কত গুরুতর কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ভারতের বিপ্লবী

ব্রজকিশোর চক্রবর্তী

বিপ্লবী ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর জন্ম ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের বল্লভপুরে। পিতা উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। তারপরে বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- ছৌ নাচের জন্য পুরুলিয়া জেলা বিশ্ববিখ্যাত।
- পুরুলিয়ার ছৌ নাচ ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের স্বীকৃতি পেয়েছে।
- বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কুষ্ঠ হাসপাতাল পুরুলিয়া শহরের ভাটবাঁধ পাড়ায়।
- পুরুলিয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছৌ নৃত্যশিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া।
- পুরুলিয়া জেলার প্রধান নদ-নদী হলো দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, কুমারী, দুধভরিয়া, ঢাকা ও হনুমতী।
- লাক্ষা ও তসর জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল।

ভালো কথা

ভাদুকাকা

সেদিন আমাদের পাড়ার ভাদুকাকা সকালে জমিতে কাজ করতে যাচ্ছিল। বড়ো রাস্তায় বাসস্টপে রোল করা টাকা দেখতে পায়। ভাদুকাকা তুলে নিয়ে খুলে দেখে কুড়িটা পাঁচশো টাকার নোট। কী করবে ভাবতে ভাবতে দেখে বীরেনকাকা তার চায়ের দোকান খুলছে। ভাদুকাকা বীরেনকাকাকে টাকাগুলো দিয়ে বলল দেখো কারও টাকা পড়ে গেছে, নিশ্চয় খুঁজতে আসবে। আমার তো দেরি হয়ে যাবে, তুমি রাখো। ভাদুকাকা কাজে চলে গেল। টাকার কথা ভুলেই গেছিল। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা পাশের গ্রামের একজন ভাদুকাকাকে বলে তুমি আমার খুব উপকার করেছ ভাই। মা হাসপাতালে ভর্তি আছে, তাই টাকা নিয়ে যাচ্ছিলাম। বাসে উঠে দেখি পকেটে টাকা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে খোঁজ করতেই চায়ের দোকানদার আমাকে দিয়ে দিয়েছে। তুমি নাকি পেয়েছিলে। ভাদুকাকা বলল টাকাটা না পেলে তোমার মায়ের চিকিৎসা হতো না যে। বাবা ঘটনাটা আমাদের বলেছে। ভাদুকাকা গরিব হলেও খুব সৎ আর বীরেনকাকাও নির্লোভী।

কুণাল চক্রবর্তী, দশম শ্রেণী, জয়নগর, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ত্তা নি প	(১) ত ভি শো কা র তা
(২) না রি মা	(২) ধ র তু ল যা ব

১৮ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) গাণিতিক (২) অজুহাত

১৮ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) আত্মগোপনকারী (২) আত্মনির্ভরশীল

উত্তরদাতার নাম

(১) সোমশুভ্র দাস, মিশন রোড, বেলঘড়িয়া, কল-১০৮। (২) সোমক হালদার, বৈষ্ণবনগর, মালদা (৩) অরুণিমা সরকার, পাকুয়াহাট, মালদা। (৪) শুভম সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

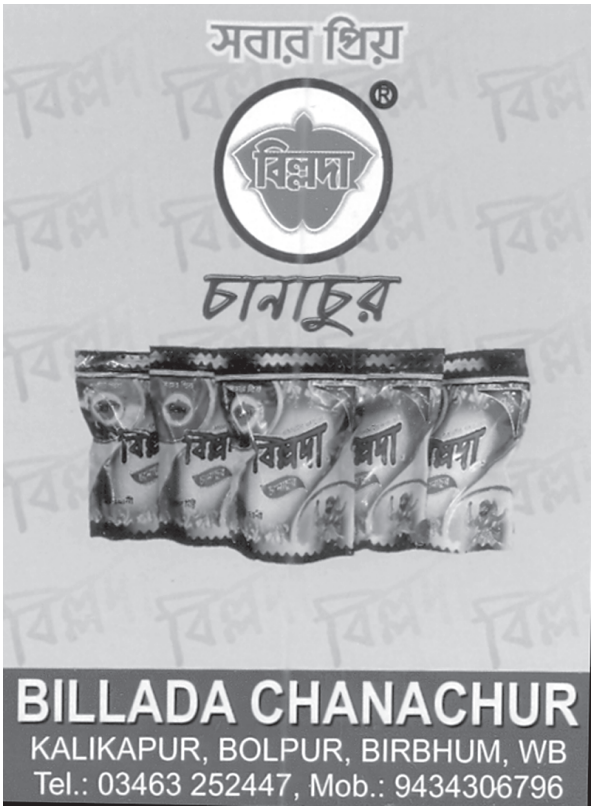

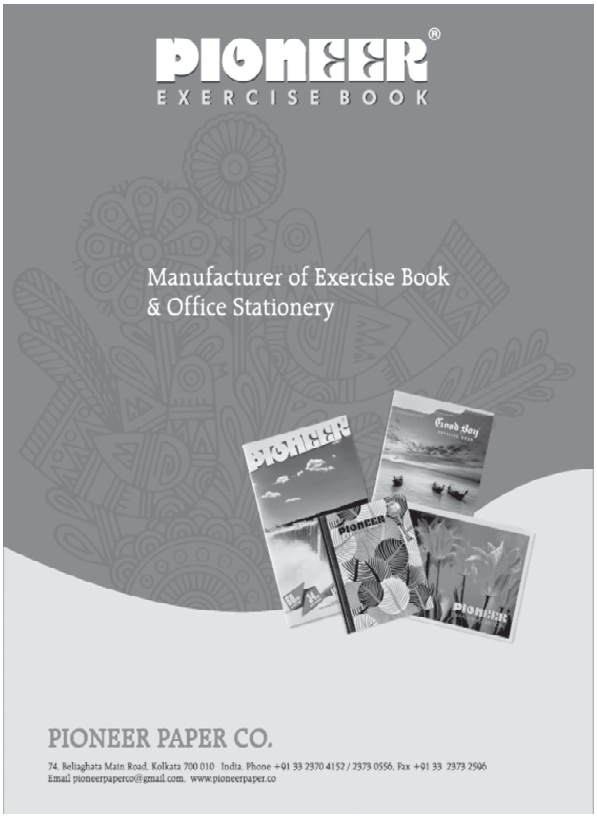

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

দাগি দমনে ইতিহাস গড়ে ফিরে এসেছেন বুলডোজার বাবা

দুর্গাপদ ঘোষ

‘যোগীজী জব আয়ি গয়ী তব ডর কিসকা বা, ফিজা মে উড়াও গুলাল ডর কাহে কা বা।’ গত ১০ মার্চ পাঁচ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবার সপ্তাখানেকের মধ্যে ছিল হোলি উৎসব। সে সময় এই স্লোগানে মুখর হয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে রঙে-আবিরে হোলি খেলেছেন বারাণসী সংলগ্ন এলাকার মুসলমান মহিলারা। কথাগুলোর বাংলা করলে মোটামুটি মানে দাঁড়ায় এইরকম— যোগীজী যখন এসে গেছেন তখন আর ভয়ের কী আছে, মনের আনন্দে আকাশে-বাতাসে আবির ওড়াও, এখন আর কাউকে ভয়ডর করার কিছু নেই। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যোগী আদিত্যনাথের ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের পর একইভাবে প্রাণ খুলে হোলি খেলেছেন অযোধ্যায় হাসিম আনসারির পরিবার ও অন্যান্যরা। মথুরাতেও এরকম চিত্র দেখতে পাওয়া গেছে। হিন্দুদের কথা তো বলাই বাহুল্য। হোলির প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকেই গোটা রাজ্যে শুরু হয়ে যায় হোলি উৎসব। সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত পরিবেশে বাদ্যি-বাজনায়, নাচে-গানে, আবিরে-আবিরে রঙিন এক স্বপ্নের রাজ্যের রূপ নেয় উত্তরপ্রদেশে। ২০১৭ থেকে ভারতের এই বৃহত্তম প্রদেশে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীপদে বসার পর থেকে যোগী সরকার তথা প্রশাসন কত কড়া হাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে, আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে এবং একইভাবে তা রক্ষা করে যাচ্ছে এই সব ঘটনাকে তার উল্লেখযোগ্য নমুনা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

যোগী জমানায় মানুষ অনেক স্বস্তিতে এবং আতঙ্কহীন পরিবেশে জীবনযাপন করতে পেরেছে। যোগী ভয়মুক্ত স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছেন, জনগণও নির্ভয়ে ভোট দিয়ে ফিরিয়ে এনেছে যোগীকে।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, কোনো রাজনীতির রং কিংবা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ধর্ম-বর্ণ বাদ-বিচার না করে গুন্ডা-বদমাশ, সমাজবিরোধী, ধর্ষক, অপহরণকারী, তোলাবাজ, গ্যাংস্টার- মাফিয়াদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রস্থাপন করা হয়েছে প্রকৃত ও আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। যাবতীয় বেআইনি, দুর্নীতির টাকায় তৈরি করা ফার্মহাউস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ইমারত, শপিংমল এবং অন্যান্য নির্মাণকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যোগী সরকার। সে কারণে যোগীর ভাবমূর্তি ‘বুলডোজার বাবা’-র পরিচিতি লাভ করেছে। পরিচয়টা এখন এতটাই খ্যাতিলাভ করেছে সে সামুহিক বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নব দম্পতিদের উপহার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে প্রতীকী খেলনা ‘বুলডোজার’। গত ২৭ মার্চ

ফঃ ৬

প্রয়াগরাজ জেলার কাটরাতে 'যুজা চৌরাসিয়া সমাজসেবা ট্রাস্ট' এরকম এক সামুহিক বিবাহের আয়োজন করে ৭ জোড়া নবদম্পতিকে প্রতীকী বুলডোজার উপহার দিয়েছে। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, বুলডোজার এখন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির জয়ের প্রতীক। নবদম্পতিদের বলা হয়েছে যে, সারা জীবন তারা যেন সদাচারের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করে। এ থেকে অনুমান কর যেতে পারে যে উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকার অশুভশক্তির বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নিয়েছে সাধারণ মানুষ তাকে কীভাবে স্বাগত জানাচ্ছে। সমস্ত জায়গার পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোথাও কোনো ভেদাভেদ না রেখে, কোনো ধর্ম-বর্ণ, রাজনীতির রং না দেখে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যেন যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কারো কোনো অপরাধ যেন আড়াল না করা হয়, এতটুকুও বরদাস্ত না করা হয়। কোনো অপরাধী যেন আইনের শাসন থেকে নিষ্কৃতি না পায়।

রাজনীতির পণ্ডিতরা জানেন যে, কোনো একটা নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভের পেছনে সঠিক প্রার্থী চয়ন ছাড়াও আরও অনেক বিষয় থাকে। থাকে অনেক ইক্যুয়েশন, পারমুটেশন-কম্বিনেশন। এবার উত্তরপ্রদেশেও তা ছিল। কিন্তু উল্লেখিত তিনটে ঘটনা থেকে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে যোগীর লাগাতার দ্বিতীয়বারের এই জয়ের প্রেক্ষাপটে একটা খুব বড়ো এবং অন্যতম প্রধান কারণ হলো গোটা উত্তরপ্রদেশের মানুষের পাশে থেকে আতঙ্কমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। একই সঙ্গে অপরাধী তথা অপরাধ প্রবণদের কাছে তৈরি হওয়া ভয়ের বাতাবরণ। এই প্রতিবেদনের মুখ্য অলোচ্য বিষয় হলো এটাই।

দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পরে লাগাতার দ্বিতীয়বার জয়ের ইতিহাস রচিত হয়েছে তাই নয়, বিজেপির পক্ষে ১.৬ শতাংশ ভোটও বেশি এসেছে এবার যা ছিল সমস্ত রাজনৈতিক পণ্ডিতদের ধারণার বাইরে। ২০১৭ সালে বিজেপি যখন মোট ৪০৩ আসনের মধ্যে ৩২৫ আসনে জিতেছিল সেবার ভোট পেয়েছিল ৩৯.৭ শতাংশ। এবার আসন সংখ্যা কমে ২৭৩ হলেও ভোটের হার বেড়ে ৪১.৩ শতাংশে উঠেছে। আর এটা হয়েছে প্রায় ২ বছর ধরে মহামারিরূপী করোনার ছোবল, ঘনঘন লকডাউন, পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা, প্রায় এক বছর যাবৎ কৃষক আন্দোলন ইত্যাদির পরেও। এত প্রতিষ্ঠান-বিরোধী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাজ্যের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আগের সরকারগুলোর আমলে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মহিলারা যোগীকে জেতানোর জন্য ঢেলে ভোট দিয়েছেন। তাঁরা সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁদের মান-ইজ্জত রক্ষার দিকে, নিরাপত্তার দিকে।

একমাস ধরে ৭ দফায় এতবড়ো একটা নির্বাচন হয়ে গেল অথচ বলতে গেলে কাকপক্ষীও টের পেল না। পশ্চিমবঙ্গের এখনকার মানুষ এটা কল্পনায়ও আনতে পারবেন না। হই-হল্লা, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দেখে নেওয়ার হুমকি, গুলি-বোমা, বিরোধী পক্ষের ভোটারদের মস্তান বাহিনী নামিয়ে বুথের পথে যেতে না দেওয়া, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা দূরে থাকুক, ক্যাডারে-ক্যাডারে উল্লেখযোগ্য হাতাহাতির ঘটনা পর্যন্ত ঘটল না। একটা যেন উৎসবের আমেজে নির্বাচন সাঙ্গ হয়ে গেল। পাঁচ বছরের শাসনকালে এরকম ভয়মুক্ত, আতঙ্কমুক্ত প্রশাসন উপহার দেওয়ায় যোগীর জনপ্রিয়তার গ্রাফ চড়-চড় করে ওপরে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এমনটা সম্ভব হয়েছে যারা এসব করে থাকে বা যাদের দিয়ে এসব করানো হয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা না করার জন্য। তার মানে কিন্তু এই নয় যে কেবল সমাজবাদী পার্টির প্রভাবশালী নেতা আজম খান, বহুজন সমাজ পার্টির প্রাক্তন সাংসদ মুখতার আনসারি কিংবা প্রয়াগরাজের আর এক বাহুবলী ও প্রাক্তন সাংসদ আতিক আহমেদের মতো বিশেষ কোনো ধর্মের এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাদের বেশিরভাগই হিন্দু এবং অনেক বিজেপিবাদীও আছে। ১.৫ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা মাথার দাম ঘোষিত যেসব অপরাধীরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নেমে খতম হয়েছে সেই সমস্ত পেশি আস্ফালনকারীদের মধ্যে যেমন শকিল আহমেদ রয়েছে তেমনি রয়েছে বিকাশ দুবে, কমল বাহাদুর, লক্ষ্মণ যাদব, উদয় ভানরাও। মোদীর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতেও ব্রিজেশ সিংহের মতো বাহুবলীকে ছেড়ে কথা বলা হয়নি। মুখতার-আজম-আতিকদের পাশাপাশি তার বেআইনি সম্পত্তিও প্রশাসনের বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেছে। সোজা পথে চলার জন্য যারা যেখানে যে ভাষা বোঝে যোগী সরকার সেখানে তাদের সেই ভাষাতেই বুঝিয়ে দিয়েছে, যে এখানে শুধুমাত্র আইনের শাসনতন্ত্রই চলবে, মাফিয়াতন্ত্রের নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সৎসাহসের ৫৬ ইঞ্চি ছাতির ডবল ইঞ্জিনে ভর করে যোগী যে সমস্ত দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তার সুফল ভোগ করে উত্তরপ্রদেশের মানুষ এবার জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁকে প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ করেছেন।

রাজ্য পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (আইন-শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার গত ২১ মার্চ সাংবাদিকদের সামনে তথ্য পেশ করে জানিয়েছেন যে, ২০১৭ থেকে ২০২২, গত ৫ বছরের মধ্যে সরকারি তরফে কেবল মাথার দাম ঘোষিত ১৫৮ জন দাগি অপরাধী পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে নেমে নিহত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গড়ে প্রতি ১২ দিনে একজন করে মারাত্মক অপরাধী পুলিশের গুলিতে খতম হয়েছে। পার পায়নি অন্যান্য অনেক অপরাধীও। কুমারের তথ্য মোতাবেক উল্লেখিত ৫ বছরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে (এনকাউন্টার) আহত অপরাধীর সংখ্যা হলো ৩ হাজার ৬৭৯ জন। ১৯ হাজার ৯৯৯ জনকে আটক করে ফাটকে পুরেছে পুলিশ। আতিক-আজম্ম-মুখতাররা বেশ কিছুদিন ধরেই জেলের ভাত খাচ্ছে। এই সমস্ত পুলিশি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভবত কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয়ে তেমনভাবে মুখ খোলেনি। দু'চারটে ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজবাদী পার্টির গড় হিসেবে চিহ্নিত পশ্চিম ইউপি-তে অভিযোগের যে আঙুল তোলার চেষ্টা হয়েছে তার জবাব দিতে গিয়ে

পুলিশকর্তা সাংবাদিকদের কাছে তথ্য তুলে ধরে জানিয়েছেন যে অপরাধীদের ধরতে গিয়ে তাদের গুলিতে উল্লেখিত সময়ে ১৩ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন ১ হাজার ২৪৫ জন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে ২০১৭ সালে যোগী সরকার গঠিত হবার আগে বিএসপি এবং এসপি সরকারের জমানায় কী পরিমাণে অপরাধীর জন্ম হয়েছিল, রাজ্যের শাসনতন্ত্র কুক্ষীগত হয়েছিল কাদের হাতে। কাদের ওপর ভর করে, কাদের জোরে এবং কীসের জোরে নির্বাচন হচ্ছিল এবং কীসের ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত হচ্ছিল। পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য মোতাবেক যাদের সঙ্গে পুলিশের এনকাউন্টার হয়েছে তাদের কারো বিরুদ্ধেই কমপক্ষে ১৫ টার কম মারাত্মক অপরাধের অভিযোগ ছিল না। পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের সময় গত ৯ মার্চ পর্যন্ত যতজন অপরাধীর মৃত্যু হয়েছে তাদের ৬১ জনই হলো মীরাট অঞ্চলের। আর ধৃতদের মধ্যে মোট ৫ হাজার ৭৯৫ জন হলো ৮টা পুলিশ জোনের। তার মধ্যে একটা হলো লক্ষ্ণৌ জোন। এই জোনে অন্তত ৭ বার অপরাধী-পুলিশ সংঘর্ষ তথা গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে যোগীর নিজের ক্ষেত্র গোরক্ষপুর পুলিশ জোনে এনকাউন্টার হয়েছে মাত্র ১ বার। এছাড়া ১০ মার্চ নির্বাচনী ফল প্রকাশের দিন থেকে ২৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীপদে দ্বিতীয়বার শপথ নেবার দিন পর্যন্ত ১৫ দিনের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে ২১০ বার এনকাউন্টার হয়েছে। তার মধ্যে বারাণসী এলাকায় হয়েছে ৮টা। সবাচাইতে বেশি ৩৫টা হয়েছে মীরাট অঞ্চলে। তাতে বাণাণসীতে ২ এবং মীরাটে ১৮ জন নিহত হয়েছে। বাকিদের মৃত্যু হয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্যান্য জায়গায়। এরপর থেকেও নিয়মিত প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গত ২৯ মার্চ বারাণসী এলাকায় পুলিশের গুলিতে ২ জন দাগি অপরাধী গুরুতর আহত অবস্থায় ধরা পড়েছে। প্রায় রোজই রাজ্যের কোথাও না কোথাও অপরাধী, দুর্নীতিবাজদের বেআইনি নির্মাণের ওপর বুলডোজার চালানো হচ্ছে। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের আগে বিরোধীদের পক্ষ থেকে জেতার দাবির প্রচারে উৎসাহিত হয়ে অনেক অপরাধী ফের মাথাচাড়া দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিরোধী দলগুলো কুপোকাত হয়ে যাওয়ায় তাদের পেশি আস্ফালন, পাড়ায় পাড়ায় দাপিয়ে বেড়ানো শুধু যে বন্ধ হয়ে গেছে তাই নয়, আত্মসমর্পণেরও যেন লাইন পড়ে গেছে। ১০ থেকে ২৫ মার্চ ওই ১৫ দিনের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ জন দাগি নিজে থেকে থানায় হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করে আর কোনোদিন অপরাধের জগতে পা বাড়াবে না বলে মুচলেকা দিয়েছে। অনেক ঘোষিত অপরাধী নিজেদের গলায় প্লাকার্ড ঝুলিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ থানায় এসে ধরা দিয়েছে। অন্তত ২৩ জনের গলায় ঝোলানো প্লাকার্ডে লেখা ছিল 'আমরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে চাই না, গ্রেপ্তার হতে চাই।' বিশেষ করে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, গোণ্ডা ইত্যাদি জেলায় এরকম ঘটনা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। প্রসঙ্গত, এবারের নির্বাচনে পশ্চিম ইউপি-তে বিরোধীদের দুর্গে হানা দিয়ে বেশ কয়েকটা মজবুত স্তম্ভকে ধরাশায়ী করে আসন দখল করে নিয়েছে বিজেপি।

উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকারের আগে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা সমাজ বিরোধী, দুষ্কৃতীদের দাপাদাপির মাত্রা কোথায় পৌঁছেছিল তা লালু জমানার বিহার এবং মমতা জমানার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মনে হয় সবচাইতে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। ভারতের বৃহত্তম প্রদেশে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবের শাসনকালে ২০১৪ সালে নথিভুক্ত ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল ৩ হাজার ৪৬৭টা। ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ৪ হাজার ৮১৬। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে তাঁদের বিরুদ্ধে বা তাঁদের ওপরে যে সমস্ত অপরাধের ঘটনা ঘটে থাকে তার মধ্যে সবচাইতে ঘৃণ্য, জঘন্য ও আতঙ্কজনকে ঘটনা হলো গণধর্ষণ। এমনকী একক ধর্ষণও। মহিলাদের কাছে বলাৎকার কেবল তাদের ওপর জবরদস্তিই নয়, চরম অপমান এবং আত্মগ্লানিরও। ২০১৭ সালে যোগী সরকার গঠিত হবার পর ধর্ষণের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়ে যায়। যে কারণে ২০২০-তে রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা প্রায় ৪৮ শতাংশ কমে হয় ২ হাজার ৭৬৯টা। এছাড়া ২০১৪ সালে খুনের ঘটনা ঘটেছিল ৫ হাজার ১৫০টা। ২০২০-তে তা ৩ হাজার ৭৭৯-এ নেমে যায়।

প্রথম যোগী সরকার গঠিত হবার প্রাক্কালে রাজ্যে চুরি-ডাকাতির ঘটনা বেড়ে ৬০ হাজার ৪৩৪ হয়েছিল। এটা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত তথ্য। এর বাইরে যে আরও কত ঘটেছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ অভিযোগ নথিভুক্ত করতে রাজি হয়নি বলে বিস্তর অভিযোগ ওঠে। যোগী সরকার আসার পর পুলিশের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগের হার অনেকটাই কমে গেছে। উপরন্তু ২০২০-তে চুরি-ডাকাতির ঘটনা প্রায় ৪৬ শতাংশ কমে গিয়ে হয় ৩৩ হাজার ২৫০টা। স্বামীনাথন এস আঙ্কেলসরিয়া আয়ারের মতো একজন দুঁদে সাংবাদিক উত্তরপ্রদেশে অপরাধের ওপর একটা সার্ভে করার পর গত ১৩ মার্চ সে তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, আগের মুখ্যমন্ত্রীদের জমানায় দাগিদের বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্তে অনবরত রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তক্ষেপ করা হতো। যোগী আসার পরে তা বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে তাদের নিজেদের পদ্ধতি মতো স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে। এজন্য বেশ কয়েকজন পদস্থ পুলিশকর্তা প্রকাশ্যে সন্তোষও ব্যক্ত করেছেন।

২০১৭-তে যোগী জমানা শুরু হবার আগে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো প্রায় মুড়ি-মিছরির মতো। যার বেশিরভাগেরই পেছনে থাকত রাজনৈতিক মদত। যোগীর জমানার ৫ বছরে সেরকম একটাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে দেওয়া হয়নি। যোগী জমানায় মানুষ অনেক স্বস্তিতে এবং আতঙ্কহীন পরিবেশে জীবনযাপন করতে পেরেছে। যোগী ভয়মুক্ত স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছেন, জনগণও নির্ভয়ে ভোট দিয়ে ফিরিয়ে এনেছে যোগীকে। ■

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ‘আফস্পা’ আইন উঠছে

তারক সাহা

‘আফস্পা’ বা Armed Forces Special Power Act, ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত এই আইন প্রবর্তিত হয়েছিল তৎকালীন অসম রাজ্যে সন্ত্রাস দমন আইন হিসেবে। পরবর্তী সময়ে অসম সাতটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এই রাজ্যগুলি একত্রিতভাবে সেভেন সিস্টার্স নামে অভিহিত হয়। পরবর্তীকালে এই আইন শুধু মাত্র উত্তর-পূর্ব রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ১৯৮৩ সালে পঞ্জাবে এই আইন চালু করা হয়। ১৪ বছর পর পঞ্জাব শান্ত হলে এই আইন প্রত্যাহৃত হয়। কাশ্মীরেও বলবৎ হয় ১৯৯০ সালে যা আজও বলবৎ রয়েছে।

‘কালা কানুন’ নামে পরিচিত এই আইনটি পর্যায়ক্রমে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের ‘সেভেন সিস্টার’ রাজ্যগুলি থেকে উঠতে শুরু করেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রাক মোদী যুগে অবহেলা ক্রমাগত এই রাজ্যগুলিকে ঠেলে দিয়েছে সন্ত্রাসের দিকে। বিপথগামী যুবকরা শামিল হয়েছে বিচ্ছিন্নবাদীদের সঙ্গে। পরিণামে লম্বা সময় ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলি দেখেছে খুন, লুঠ, অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা। এই দীর্ঘ সময়ে খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা দাপিয়ে বেড়িয়েছে। এরা এই সাতটি রাজ্যকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ইন্ধন জুগিয়েছে।

সময় বদলেছে, বদলেছে সরকারি নীতিও। কেন্দ্র সরকারের লুক-ইস্ট নীতির ফলে ওই রাজ্যগুলিতে যে ব্যাপক উন্নয়নের জোয়ার এসেছে তার জেরেই তারা মূল স্রোতে ফিরে অস্ত্র সংবরণ করেছে, ফলত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আমূল বদল এসেছে। তাই এই কালা-কানুনের আর প্রয়োজন পড়ছে না।

পর্যায়ক্রমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে আফস্পা আইন উঠতে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে ২০১৫ সালে ত্রিপুরা থেকে। এরপর থেকে ক্রমান্বয়ে ২০১৮ সালে মেঘালয়ে এবং ২০২২ সালে অসম, মণিপুর

ও নাগাল্যান্ডের মতো উপদ্রুত অঞ্চল থেকেও পর্যায়ক্রমে উঠতে শুরু করেছে। এর নেপথ্যে রয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির সদিচ্ছা। একদা উন্নয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন এই বিশাল ভূ-খণ্ডকে বর্তমান জাতীয় উন্নয়ন, বিকাশের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এটা সম্ভব হচ্ছে কেবল কেন্দ্র ও রাজ্যের ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বহু দর্শিতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পঞ্চাশ বার প্রধানমন্ত্রী নিজে ভ্রমণ করেছেন এবং উন্নয়নের বিষয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলেছেন। অতীতে কোনও প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এতবার সফর করেননি।

শুধু প্রধানমন্ত্রী কেন, এই কর্মযজ্ঞে শামিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিও। তাঁরই উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তি এবং কার্বি আংলং শান্তি চুক্তি। এই চুক্তির ফলে ত্রিপুরায় এনএলএফটি ৬৯০০ জঙ্গি তরুণ আত্মসমর্পণ করেছে এবং উদ্ধার হয়েছে ৪৮০০টি অস্ত্র। সমান্তরালভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতায় আন্তঃরাজ্য জঙ্গি সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং এদের আর্থিক উৎসস্থলগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই দীর্ঘ তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরও একটি ঘটনা। ২৩ বছর পূর্বে মিজোরামে যে জাতিদাঙ্গা হয়েছিল তাতে বাস্তুচ্যুত ‘ব্রত’ উপজাতির সাইত্রিশ হাজার মানুষ ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। ২০২০ সালের এক সরকারি চুক্তি মোতাবেক ওই মানুষেরা ত্রিপুরা বা মিজোরাম যে কোনও রাজ্যেই পছন্দমতো জায়গায় বসবাস করতে পারবে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে বহু বছর কংগ্রেস এইসব রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিল। কিন্তু এই জাতীয় কোনোরূপ বন্দোবস্ত তারা কেন করেনি তার সদুত্তর নেই। কেন তাদের প্রণীত উত্তর-পূর্বাঞ্চল নীতিতে স্বচ্ছতা নেই? এই ভাগ ও শাসন নীতিতেই জন্ম যত অবিশ্বাসের। এই নীতিতে কারা উপকৃত হয়েছে? এই সবই উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতির ফলে মানুষ পাচার, মাদক ও গবাদি পশু চোরাচালানের মতো অপরাধ দমনে তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী। স্থায়ী শান্তি স্থাপনে রাজ্যসরকার তৎপর হয়েছে ছয় দশকের কংগ্রেসিদের অপশাসনের মূল উৎপাটনে। জনমানসে এটা নিশ্চিত করা গেছে যে, এই সেভেন সিস্টারের মধ্যে যে সীমা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে তা অচিরেই সমাধান হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি অসম, মেঘালয়ের মধ্যে যে সীমা বিবাদ ছিল তার সমাধান হয়েছে।

সামনে আসছে দেশজুড়ে এক স্বর্ণালি যুগ। উত্তর-পূর্ব যেমন শান্ত হচ্ছে, তেমনি অবদমিত হচ্ছে মাওবাদীদের সন্ত্রাস। কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতির ফলে আশি শতাংশ মাওবাদী সন্ত্রাস হ্রাস পেয়েছে। নিন্দুকেরা ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা অপসারণের পর বলেছিল যে, কাশ্মীরকে বুঝি ভারতীয় মানচিত্রে ধরে রাখা যাবে না, তাদের আশঙ্কা তো ফলপ্রসূ হয়ইনি, উলটে সেখানে জঙ্গি ক্রিয়াকলাপ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। অতীতে কংগ্রেস জমানায় সমান্তরালভাবে চলত দুই ক্ষমতাধর সরকারি চ্যানেল পিএমও এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর। বর্তমানে তার অবসান হয়েছে। □

হৃত প্রত্নিদর্শন ফেরাতে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নরেন্দ্র মোদীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতীক আমাদের অমূল্য প্রত্নসামগ্রী। বহু সামগ্রীই চোরাচালানকারীদের মাধ্যমে বিদেশে বিক্রি হয়ে গেছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতায় তা দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ভারতের সোনালি ইতিহাসের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধা এবং মমতার ফলে ২০১৪ সাল থেকে প্রায় ২২৮টি অমূল্য ঐতিহাসিক মূর্তি ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে মার্কিন সফরে গিয়ে ১৫৭টি প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী দেশে ফিরিয়ে আনেন প্রধানমন্ত্রী। চোরাচালানকারীরা এগুলি ভারত থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় মার্কিন পুলিশের হাতে বাজেয়াপ্ত হয়। ৭১টি প্রত্নতাত্ত্বিক, ৬০টি হিন্দু ধর্মের, ১৬টি বৌদ্ধ ধর্মের এবং ৯টি জৈনধর্মের প্রত্ন নিদর্শন ভারতকে ফিরিয়ে দিয়েছে মার্কিন সরকার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় 'ন্যাশনাল গ্যালারি অব অস্ট্রেলিয়া' ১৪টি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রত্নিদর্শন ভারতকে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ব্রোঞ্জ, এবং পাথরের ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প এবং ছবি। যার মূল্য ৩০ মিলিয়ন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ নেদারল্যান্ডস্ ফ্রান্স, কানাডা, সিঙ্গাপুর, জার্মানি এবং আরও অনেক দেশ ভারতের প্রত্ন নির্দশন ফিরিয়ে আনার অনুরোধকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারত এই সমস্ত দেশ থেকে প্রত্নকীর্তি ফিরিয়ে আনতেও সক্ষম হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরত আসা ২৯টি পুরাকীর্তি পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই পুরাকীর্তিগুলি অনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম থেকে দশম শতাব্দীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতে 'এই মূর্তিগুলি ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদের। এগুলি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এগুলি ভারতীয় অনুভূতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত।

এর থেকে বোঝা যায় ভারত সম্পর্কে বিশ্বের ধারণা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।' ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক প্রত্ন নিদর্শন পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল ছিল বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস। ভারত নিজের ঐতিহ্য রক্ষায় হৃত গৌরব ফেরাতে বদ্ধ পরিকর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় প্রত্নিদর্শন ফিরিয়ে এনে নিজের ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্র আরো মজবুত করছে আত্মনির্ভর ভারত।

আরও তেরোটি নদীকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। আজও আমাদের দেশের বহু মানুষ দৈনন্দিন কাজ, জীবিকার জন্য নদীর উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন অনেক নদী আছে যেগুলো ধীরে ধীরে তাদের আসল রূপ হারাচ্ছে। গঙ্গা নদীকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নমামি গঙ্গে প্রকল্পের মাধ্যমে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, এখন ঝিলম, বিপাশা, বিতস্তা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, লুনি, নর্মদা, গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণা এবং কাবেরীকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। বনায়নের মাধ্যমে এসব নদী সংরক্ষণের একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত ১৪ মার্চ একটি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। এই নদীগুলি সম্মিলিতভাবে মোট ১৮,৯০,১১০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত, যা দেশের ভৌগোলিক এলাকার ৫৭.৪৫ শতাংশ। ভারতের তেরোটি নদীর দুই ধারে গাছ লাগানো হবে। এই গাছগুলি পরবর্তী ১০ বছরে ৫০.২১ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে সহায়তা করবে। এই নদীগুলিকে তাদের উপনদী বরাবর প্রাকৃতিক, কৃষি, শহুরে এবং বনায়নের হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

বারাণসী-গোরক্ষপুর সংযুক্তিতে বিমান পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাবা বিশ্বনাথের ভূমি বারাণসী এবং বাবা গোরক্ষনাথের ভূমি গোরক্ষপুর এখন বিমান পরিষেবার মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের এই দুটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহরের মধ্যে ২৭ মার্চ উড়ান পরিষেবা শুরু হয়েছে। 'উড়ান' প্রকল্পের অধীনে এই পরিষেবা শুরু হয়েছে। এর ফলে দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব এখন মাত্র ২০ মিনিটে অতিক্রম করা যাবে। 'উড়ান' প্রকল্পের মাধ্যমে সংযুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে উড়ান প্রকল্পের অধীনে ৪০৯টি পথ এবং ৬৬টি বিমানবন্দর পরিচালিত হয়েছে এবং ৯০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পের অধীনে এক লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি বিমান পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ২০২৫ সালের মধ্যে ৩৪টি নতুন বিমানবন্দর তৈরি করার পরিকল্পনা করছে, উড়ান আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্পের অধীনে ১০০০ নতুন রুট গঠন করা হবে।

খেলনা শিল্প আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ খেলনা শিশুদের হাতে শুধু বিনোদনের মাধ্যমেই নয়, তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে। যাইহোক, আধুনিক এবং উদ্ভাবনী খেলনাগুলির চাহিদা ক্রমবর্ধমান হলেও বিদেশের খেলনাগুলি একচেটিয়া ভাবে ভারতের খেলনা বাজার দখল করে রেখেছিল। ২০২০ সালের জুন এবং আগস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে খেলনা খাতে ভারতকে স্বনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। নিরাপদ খেলনা থেকে শুরু করে ভারতের ঐতিহ্যবাহী খেলনা, খেলনা মেলা, টয়ক্যাথন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা-সহ খেলনা ক্লাস্টার তৈরির প্রচারের সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে ভারতে বিদেশি খেলনা আমদানি ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। লোকসভায় বাণিজ্য মন্ত্রকের দেওয়া একটি উত্তর অনুসারে, ২০১৮-১৯ সালে ভারত ৭১২৫ কোটি টাকার খেলনা আমদানি করেছিল, ২০২০-২১ সালে সেই অঙ্ক ৪০২৭ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য (জানুয়ারি পর্যন্ত) ২৬৫৫ কোটি টাকার খেলনা আমদানি করা হয়েছে।

কোভিড শেষ হয়নি, সতর্কতা অবলম্বন করুন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় সরকার ৩১ মার্চ থেকে কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত বিধিনিষেধ অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এখনও মানুষ কোভিডের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। কোভিডের ভ্যারিয়েন্ট বা রূপগুলি পরিবর্তিত হতে থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে, আমাদের এখনও মহামারি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং মাস্ক পরা, হাত পরিষ্কার করা এবং দুই গজের দূরত্ব বজায় রাখার মতো নিয়মগুলি অনুসরণ করে চলতে হবে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়মগুলি আপাতত বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক পরামর্শ দিয়েছে যে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত প্রতিটি সতর্কতা অনুসরণ করা উচিত। যদি কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোনও অংশে কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে রাজ্য সরকার সংক্রমণ রোধে পদক্ষেপ নিতে পারে। কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে কেন্দ্র ২০২০ সালের ২৪ মার্চ প্রথমবার বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। বর্তমানে সরকার সারাদেশে টিকাদান অভিযানের পরিধি সম্প্রসারিত করেছে। ভারত সম্পূর্ণ টিকাকরণের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ২৯ মার্চ পর্যন্ত সারাদেশে ১৮৩.৫৩ কোটিরও বেশি টিকার ডোজ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ১২-১৪ বছর বয়সি ১.৩৬ কোটিরও বেশি কিশোর-কিশোরীদের কোভিড-১৯ টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ১৬ মার্চ থেকে ১২-১৪ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের

কোভিড-১৯ টিকাকরণ শুরু হয়েছিল। ২৯ মার্চ ভারতে কোভিড সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে হয়েছে ১৫,৩৭৮। সারা দেশে সক্রিয় রোগী রয়েছে ০.০৪ শতাংশ এবং কোভিড থেকে সেরে ওঠার হার ৯৮.৭৫ শতাংশ। অন্যদিকে ৫০ শতাংশের বেশি ১৫-১৭ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা পান, তার জন্য ২০২১ সালের ২১ জুন থেকে নতুন টিকাকরণ পর্ব শুরু হয়েছিল। অধিক সংখ্যক টিকার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে টিকাদান অভিযানের গতি বাড়ানো হয়েছে। ভারত বিশ্বমানের টিকা প্রস্তুত করেছে এবং ১৫০টিরও বেশি দেশে টিকা সরবরাহ করেছে।

৪০০ বিলিয়ন ডলার অর্থ রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোভিড অতিমারির কারণে সারা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলার

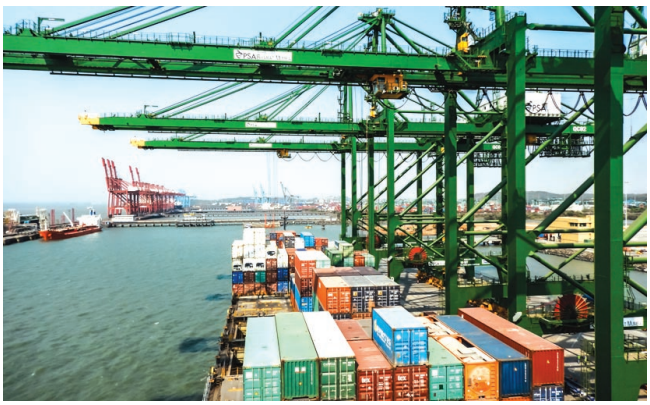

সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। এই কঠিন সময়কে তিনি সুযোগে পরিণত করেছিলেন। এর ফলে ভারত ২০২১-২২ অর্থ বছর শেষ হওয়ার নয় দিন আগে রপ্তানিতে ৪০০ বিলিয়ন ডলারে ঐতিহাসিক স্তর অতিক্রম করেছে। ভারতের রপ্তানির ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ রেকর্ড। ভারত এর আগে ২০১৮-১৯ সালে ৩৩০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছিল। পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারত প্রতিদিন গড়ে এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের রপ্তানি করে। কোভিড মহামারি চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর ভারত মিশনের অংশ হিসেবে বিশ্বজুড়ে সমস্ত অংশীদারিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি শুধু ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছেই নয়, সারা বিশ্বের সামনে ভারতীয় মিশনের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রায় দুশোটি দেশে চলমান ব্যবসার উপর নজর রেখেছিলেন। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। যে সব এলাকার পণ্য অন্যত্র প্রয়োজন হবে, এমন ৪৮০টি জেলা রপ্তানি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে পণ্যের চাহিদা এলেই আমাদের ব্যবসায়ীরা তা পূরণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'এই ভারত ৪০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এই সাফল্যের জন্য আমি আমাদের কৃষক, তাঁতি, এমএসএমই, নির্মাতা এবং রপ্তানিকারকদের অভিনন্দন জানাই। স্বনির্ভর ভারত গঠনের পথে আমাদের যাত্রায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।'

SURYA FOUNDATION

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063, Tel. : 011-25251588, 25253681
Email : suryainterview@gmail.com Website : www.suryafoundation.org

सूर्या फाउण्डेशन युवाओं के समग्र विकास तथा प्रशिक्षण के लिए अब एक जानी-मानी संस्था बन चुकी है। इसका प्रमुख उद्देश्य है देश के प्रति निष्ठा रखते हुए अनेक तरह के उत्तरदायित्व निभाने के लिए तेजस्वी, लगनशील तथा धुन के पक्के नवयुवकों का निर्माण करना।
इन्टरव्यू में चयन हो जाने के बाद सूर्या साधना स्थली कैंपस में छः माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद एक साल के लिए On Job Training (OJT) रहेगी।
संघ के संस्कारों में पले-बढ़े, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, शारीरिक रूप से सक्षम युवकों के सूर्या फाउण्डेशन में प्रवेश हेतु निम्न categories में इंटरव्यू

Post	Experience	6 months Initial Training + 1 year OJT	After Training CTC
CA	IPCC / MTER (2Yrs Experience)	3 - 4 L Per Annum	As per Performance
	Fresher	5 - 6 L Per Annum	- do -
	Experienced (upto 5 years)	6 - 8 L Per Annum	- do -
	Experienced (above 5 years)	9 - 12 L Per Annum	-do -
Engineers, Fresher & Experienced	B.Tech (IIT)	7.5 - 9 L Per Annum	- do -
	B.Tech (NIT)	4.5 - 6 L Per Annum	- do -
	B.Tech (Other Institutes)	3 - 3.6 L Per Annum	- do -
	M.Tech (IIT)	8.5 - 10 L Per Annum	- do -
	M.Tech (NIT)	5.5 - 7 L Per Annum	- do -
	M.Tech (Other Institutes)	3.6 - 4 L Per Annum	- do -
MBA	MBA (IIT + IIM)	15 L + Per Annum	- do -
	MBA (IIM)	12 - 15 L Per Annum	- do -
	MBA (Other Institutes)	3 - 3.6 L Per Annum	- do -
Post Graduate & Graduate	MCA, B.Ed., M.Ed., MSW, M.Sc., M.Com., M.A. *(Freshers / Experience) Ph.D. **	2 - 3 L Per Annum	- do -
	Mass Communication (Media)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	B.Com. with three years experience in accounts, purchase, store	2.4 L Per Annum	- do -
	B.Sc. BCA, BBA, BA, B.Com (Persuing / Passed)	1.2 L Per Annum	- do -
	Diploma	1.8 L Per Annum	- do -
Law	LLB	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	LLM	3 - 3.6 L Per Annum	- do -

- उपरोक्त Categories में अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को इससे भी अधिक वेतन दे सकते हैं।
* **Ph.D. candidates** भी आवेदन कर सकते हैं। **salary interview** के दौरान तय होगी।
* योग शिक्षक, प्राकृतिक चिकित्सक / उपचारक**, Karate Teacher, Music Teacher & Stenographer (Hindi + English)** भी आवेदन कर सकते हैं। वेतन योग्यता अनुसार दिया जाएगा।

•Graduate Management Trainee (GMT)

योग्यता–2022 में 10वीं, 11वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 60% तथा गणित में 75% अंक प्राप्त किए हों। आयु : 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद On Job Training (OJT) or Practical Campus Training (PCT) में भेजा जायेगा। OJT / PCT के साथ-साथ ग्रेजुएशन और MBA या MCA करने की सुविधा दी जायेगी। प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा मुफ्त रहेगी, साथ ही 5,000/- प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलेगा। On Job Training के दौरान आवास तथा पढ़ाई के साथ-साथ 11वीं में 8000/-, 12वीं में 10,000/- Graduation Ist year में 12,000/-, IInd Year में 15,000/-, IIIrd Year में 18,000/-, MBA/MCA Ist Year में 22,000/-, MBA/MCA IInd Year में 27,000/- Stipend प्रतिमाह मिलेगा। MBA/MCA पूरा होने के बाद 40000/- और Work Performance के आधार पर प्रतिमाह वेतन / मानधन इससे अधिक भी हो सकता है।

• Assistant Staff Cadre (ASC)

योग्यता–2022 में 10वीं, 11वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 55% एवं गणित में 60% अंक प्राप्त किए हों। आयु : 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद OJT / PCT में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 3000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा तथा मुफ्त भोजन और रहने की व्यवस्था होगी। तीन वर्ष की OJT / PCT के दौरान Stipend - Ist year : 8,000/- प्रतिमाह व आवास, IInd year : 10,000/- प्रतिमाह व आवास, IIIrd year : 12,000/- प्रतिमाह व आवास। After training 15,000/- (CTC) प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

• Under Graduate Management Trainee (UGMT)

योग्यता–2020 में 12वीं कर चुके भैया आवेदन कर सकते हैं। 12वीं में न्यूनतम अंक 70% प्राप्त किए हों और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आयु : 19 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद On Job Training (OJT) or Practical Campus Training (PCT) में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा मुफ्त रहेगी। OJT / PCT के साथ-साथ Graduation के बाद MBA/PG in Mass Communication करने की सुविधा दी जायेगी। इस दौरान आवास तथा पढ़ाई के अलावा Graduation IInd year में 12,000/-, IIIrd Year में 14,000/- तथा Post Graduation Ist Year में 17,000/- तथा IInd Year में 20,000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा। Post Graduation पूरा करने के बाद 30,000/- (CTC) प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में ही भरकर भेजें। विस्तृत बॉयोडाटा के साथ-साथ यदि आपने NCC / NSS / OTC / ITC / शीत शिविर / PDC आदि कोई शिविर किया है तो उल्लेख करें। सेवा भारती / विद्या भारती / वनवासी कल्याण आश्रम के किसी विद्यालय / छात्रावास या संघ या परिषद अथवा विविध क्षेत्रों से संबंध रहा है तो कब और कैसे। सूर्या परिवार में कोई परिचित हों तो उनका नाम, विभाग भी जरूर लिखें। पढ़ाई का विवरण लिखते हुए, Mark sheet की फोटोकॉपी साथ जोड़ें।
कृपया विस्तारपूर्वक बायोडाटा के साथ निम्नलिखित पते पर अपना **CV /** आवेदन भेजें। **CV /** आवेदन **Email** से भी भेज सकते हैं।

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063 | Email : suryainterview@gmail.com

आवेदन विज्ञापन छपने के एक माह के भीतर करें